নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং, কলিকাতা—৯

প্রকাশক
শ্রীভবেশ ঘোষ
ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন
কলিকাতা—৭

প্রচ্ছদপট
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

আড়াই টাকা

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র

কল্যাণীয়েষু

অসমতল আমার প্রথম গল্প সংকলন। গল্পগুলির বেশির ভাগই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে রচিত। তবে আমার ধারণা পরিবেশটা বেশ মাত্র; এমন কি অনেক সময় ছদ্মবেশ।

দ্বিতীয় সংস্করণে ফেরিওয়ালা গল্পটি নতুন সংযোজিত হ'ল।

পাইকপাড়া

১লা বৈশাখ ১৩৬৩। নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নেতা

একটা ক'রে বালতি প্রত্যেকের হাতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের কাছ থেকে আবদার-মিশ্রিত ফরমায়েস এল, 'আর দেরি কেন চন্দরদা, আরম্ভ হোক।'

মানে গল্প আরম্ভ হোক। চন্দ্র চাটুয্যের মুখ না চললে কারো হাত চলে না। এ-কথা সকলেই জানে।

মোমে আর ক্যানভাসে তৈরী নীল রঙের ছোট ছোট বালতি। সৈনিকদের ব্যবহার্য। দৈর্ঘে-প্রস্থে আঙ্গিক গড়নটা ঠিক নক্সা মাফিক হয়েছে কিনা মিলিয়ে দেখতে হয়; তলার চার দিকটা টিপে টিপে পরীক্ষা করতে হয়, কোথাও ছেঁড়া ফুটো আছে নাকি, সব জায়গায় সেলাই পড়েছে কিনা যথাযথ। কনট্রাক্টররা যাতে যাতে বাজে মাল না চালিয়ে যায়--তাই সরকারী তরফ থেকে আমরা পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছি।

যুদ্ধের কাজে না লাগে এমন জিনিস নেই। সৈনিকদের পায়ের জুতো,গায়ের গেঞ্জি, মাথার বালিশ, শোয়ার বিছানা থেকে আরম্ভ ক'রে কত রকম আবরণ-আভরণেরই যে যাচাই-বাছাই হয় এই ডিপোতে তার সব নামও জানি নে, জানবার কথাও নয়। একেক রকম জিনিসের জন্য একেক দল পরীক্ষক, একেক দল শ্রমিক আর পরিচালক হিসাবে বিভিন্ন পদের সামরিক উপাধিধারী একেক জন শ্বেতাঙ্গ।

চন্দ্র চাটুয্যের কাছে গল্প মানেই অবশ্য আদিরসের গল্প। চাটুয্যে বলেন, 'আর রস মানেই আদিরস। ও শুধু আদি নয়, অন্তও।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মানেটা কি হলো চন্দরদা।

'কেন লজ্জা দিচ্ছ ভায়া। মানেটা তো আমার চেহারাতেই আছে।'

তাঁর স্বীকারোক্তিতে আমরাই লজ্জিত হলাম। আদিরসের কিছু কিছু অন্তিম আভাস চাটুয্যের চেহারায় অনুমান ক'রে আমরা নিজেরাই একদা কানাকানি করেছিলাম—লোকটি ডাক্তারী পরীক্ষায় পার হলো কি করে? আলোচনার কিছু কিছু চাটুয্যের কানে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু সন্দেহজনক চেহারা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে চাটুয্যের প্রতিপত্তি নিঃসন্দেহেই বেড়ে যেতে লাগল। দিনে একেক জনের হাজার ক'রে বালতি পাশ করার হুকুম। কিন্তু চাটুয্যে বাকেট প্রায় ছুঁয়েও দেখেন না। কেবল যখন সাহেবদের আসতে দেখেন, তখন একেকটা বালতি হাতে তুলে নেন। চাটুয্যের ভাগের কাজ ভাগাভাগি ক'রে বিনা আপত্তিতে আর সবাই ক'রে দেয়। চাটুয্যের কেবল রস জোগাবার ভার। গাঁজা, গুলি, চরস, ফুটুস্ কত রকমের নেশা আছে সংসারে। দেশভেদে তার নানা রকম নাম, উপভোগের নানা রকম প্রকরণ। বর্মী নেশা, ফরাসী নেশা, চীনে নেশা, যা চাটুয্যে সব চেখে দেখেছেন—সেই সব নেশার গল্প আমাদের প্রমত্ত ক'রে তোলে। আমাদের অতুলের স্বভাবটা কিছু নাস্তিক গোছের। সে একদিন শ্লেষ ক'রে বলেছিল, 'ওসব দেশেও কি পদধূলি দিয়ে এসেছেন না কি চাটুয্যেদা?'

চাটুয্যে ভয়ানক চটে গিয়েছিলেন, 'দরকার কি বাবা, কলির গুপ্তবৃন্দাবন এই কলকাতাই যথেষ্ট। চাই কেবল ট্যাঁকের নীচে পয়সা, আর কপালের নীচে একজোড়া চোখ। এখানেই সব পাবে।'

আলোচনাটা একটু রুচি-সম্মত করবার জন্য আমি প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হয় নি। চাটুয্যের রসস্রোতে সব কিছু ভেসে গিয়েছিল।

সুরুচি-প্রসঙ্গে চাটুয্যে আমাকে একদিন আপোষে বলেছিলেন, 'প্রভুপাদ, তোমার তিলক চন্দন আর জপের মালা এখানে বার ক'রে

কাজ নেই, তাহলে কোম্পানীর কাজ পড়ে থাকবে, সৈন্যরা বালতি পাবে না। আর দু'দিন যেতে না যেতে আমরা দলকে দল অকেজো ব'লে বাতিল হয়ে যাব। এই কড়া রোদে আট দশ ঘণ্টা বসে বসে যারা বালতি টিপবে তাদের মনটা যদি একটু রসস্থ করতে চাও ত হাঁড়ি হাঁড়ি তাড়ি আমদানী কর, তুলসী পাতায় ক'রে গঙ্গাজলের ছিটা দিতে যেয়ো না। কই এত তো সর্দারি করো—আমাদের মাথার ওপর দিয়ে একটা সামিয়ানা টাঙিয়ে দাও দেখি সাহেবকে বলে।'

প্রথমটা আমাদের পরীক্ষার কাজ ঘরের ভেতরেই চলত। আমরা পরীক্ষকেরা বসবার জন্য পেয়েছিলাম সরু বেঞ্চ আর বালতি রাখবার জন্য লম্বা টেবিল। কিন্তু লরীর পর লরী বালতিতে সমস্ত ডিপো যখন ভরে উঠবার জো হলো, অর্ডার এলো একেকজনকে হাজার ক'রে বালতি পাশ করতে হবে, তখন একদিন খোদ বড় সাহেব এসে আমাদের সেই সব সাহেবী আসবাব বাতিল ক'রে দিলেন। না হ'লে আশানুরূপ কাজ এগুবে না।

ঘর থেকে আমরা প্রাঙ্গণে নেমে এলাম। বসবার কোন নির্দিষ্ট আসন রইল না। কেউবা একটু খবরের কাগজ, কেউবা সাহেবকে লুকিয়ে বাতিল-করা পাঁচ সাতটা বালতিই ঢেকে ঢুকে চেপে বসে। মাথার ওপরে রৌদ্রোদ্ভাসিত নীলাকাশ আর সামনে নীলাভ বালতি-সমুদ্র। চাটুয্যের খোঁচা খেয়ে সেক্‌সন্‌-ইনচার্জ ডসনের কাছে সেদিন দরবার করতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন এক কন্‌ট্রাক্টরের সঙ্গে গোপন পরামর্শে ব্যস্ত, বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হয়েছে কি?'

সবিনয়ে বললাম, 'হতচ্ছাড়া রোদ বড় বেশি জোরে উঠেছে, চামড়ায় আর সহ্য হচ্ছে না।'

ডসন একটু হেসে বললেন, 'সত্যি নাকি? নিজেদের দেশের রোদ নিজেরা সহ্য করতে পার না, আর সাত সমুদ্দুর তের নদী ডিঙিয়ে আমরা বিদেশীরা কি ক'রে পারছি? আসলে তোমাদের মত আরাম-প্রিয় জাত আর দুটি নেই। আমার গা'টা একটু টিপে দেখে বললেন,

ইস, ঠিক একেবারে মেয়েমানুষের মত। নরম, এর চেয়ে তোমাদের গোটা জাতটা যদি পুরোপুরি মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মাত, যুদ্ধে অনেক বেশি কাজে আসত!' সাহেব হেসে উঠলেন। তারপর সস্নেহে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও যাও—কাজ করো গিয়ে। রোদ আড়াল করবার ব্যবস্থা শিগ্‌গিরই হচ্ছে।'

সে ব্যবস্থা অবশ্য এখনো হয় নি।

গল্পের ফরমায়েস পেয়ে চাটুয্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের গল্প শুনবে?'

শিবু দলের মধ্যে সব চেয়ে বয়সে ছোট। বছর পনের ষোলর বেশী বয়স হবে না। কিন্তু চাটুয্যের সাহচর্যে ইতিমধ্যেই বেশ পেকে উঠেছে। সে ব'লে উঠল, 'আজ আর কোন নেশার গল্প নয়। রোজ রোজ গুলি আর চরস ভালো লাগে না। আজ প্রেমের গল্প বলুন।'

চাটুয্যে তার দিকে এক চোখ বুজে মুচকি হেসে বললেন, 'মাইরি! প্রেমের গল্প মানে তো সেই মেয়ে মানুষের গল্প? সেও তো এক নেশারে দাদা, গুলি-চরসের চেয়েও পাজী নেশা। ও নেশার সব চেয়ে বড় অসুবিধা, ওতে আনুসঙ্গিক লাগে। সাদা চোখে আর সাদা মুখে ও নেশায় আমেজ লাগে না।' ব'লে চাটুয্যে সকলের আগে শিবুর কাছেই আজ প্রথমে হাত পাতলেন, 'কই দে দেখি।'

শিবু লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, 'কি দোব।'

চাটুয্যে তার দিকে তাকিয়ে অসংকোচে বললেন, 'দেখ, অমন সুন্দরীপনা করিস নে। কি করতে কি ক'রে বসি ঠিক কি। কি আবার দিবি, বিড়ি।'

ঠিক এই সময়ে বড় সাহেব ক্যাপ্টেন উইলসন্‌ এসে উপস্থিত হলেন, আর সঙ্গে ডসন। অনেকক্ষণ আগে থাকতেই অলক্ষ্যে তাঁরা যে চাটুয্যেকে লক্ষ্য করছিলেন—তা কেউ দেখিনি। সামনে এসে ক্যাপ্টেন গর্জে উঠলেন 'ইউ ব্লাডি ওল্ড চ্যাপ্, সকাল থেকে কেবল গল্পই করছে, গল্পই করছে। সেক্‌সনের কাজ এগুবে কি ক'রে?' ডসনের দিকে

তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোও, এ সব দিকে লক্ষ্য করো না ? উচিত শিক্ষা দিতে পার না এই বুড়ো বাঁদরটাকে ?'

সাহেব চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উচিত শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি নিজেই ক'রে গেলেন। চাটুয্যের একদিনের রোজ ফাইন হয়ে গেল। চাটুয্যে কাঁদো কাঁদো ভাবে ক্যাপ্টেনের পা জড়িয়ে ধরতে চাইলেন, 'একেবারে ম'রে যাব—একেবারে ম'রে যাব স্যার।'

সাহেব ততক্ষণ অনেক দূর চলে গেছেন।

আমরা সবাই বললুম, 'আপনার কোন চিন্তা নেই চাটুয্যেদা, এ ফাইন আমরা সবাই চাঁদা ক'রে দেব।'

চাটুয্যে বললেন, 'ও সব ছেঁদো কথায় আমি ভুলিনে। এই ফাইন রদ কর। আর বুড়ো ব্রাহ্মণকে ম্লেচ্ছের বাচ্চা সকাল বেলায় যে অপমানটা ক'রে গেল তার শোধ তোলো। তবেই বুঝব, তোমরা আমাকে ভালোবাস। মান অপমান ব'লে সত্যিই কোন জ্ঞান আছে তোমাদের।'

বললুম, 'কিন্তু সাহেবের বাক্য যে বেদ বাক্য—ওর কি আর নড়চড় হবার জো আছে।'

চাটুয্যে সবাইর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোন, শোন, আমাদের বিদ্যার জাহাজ, বুদ্ধির সাগর, নেতাজীর কথা শোন একবার! ইনি কেবল চরিত্তির বাঁচাতেই জানেন, মান প্রাণ বাঁচাবার ধার ধারেন না।'

সবাই আমাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরল। এর বিহিত করবার জন্য আমি ছাড়া আর লোক নেই। মনে মনে একটু গর্ব বোধ না ক'রে পারলুম না। দলের মধ্যে চাটুয্যের আসন এতদিনে টলেছে।

বললুম, 'বিহিত করবার চেষ্টা আমি করতে পারি—সবাই যদি শক্ত হয়ে আমার পাশে দাঁড়াও।'

সকলে সমস্বরে বলল, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

চাটুয্যে অতিশয়োক্তিতে ওস্তাদ। আমার হাত জড়িয়ে ধ'রে

বললেন, 'পাশে নয়, পাশে নয়—আমরা তোমার পায়ের নীচে পড়ে থাকব, যদি এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার। নিতে পার কি, নিতেই হবে তোমাকে।'

রমেশ বলল, 'অন্যায়ের প্রতিকার এই সব ছোট খাটো ব্যাপার নিয়েই শুরু হয়।'

বিপিন সায় দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। কচু গাছ কাটতে কাটতেই লোকে ডাকাত হয়ে ওঠে।'

বললুম, 'খুব কিন্তু শক্ত হ'তে হবে প্রত্যেককে। দরকার হলে চাকরির মায়া পর্যন্ত ছাড়তে হবে।'

চাটুয্যে বললেন, 'থুঃ থুঃ, এ চাকরির মুখে আমি পেচ্ছাব করি।'

সবাই বলল যে, এই অতি ক্ষণস্থায়ী চাকরি প্রত্যেকের কাছেই অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু।

ডসনকে গিয়ে ধরলাম, 'চাটুয্যের ফাইন মাপ করতে হবে।'

ক্যাপ্টেনের ধমক খেয়ে ডসনের মেজাজ আরও চ'ড়ে গেছে। ডসন মুখ খিঁচিয়ে উত্তর দিলেন, 'গোলমাল কোর না। কাজ কর গিয়ে। আর ফের যদি বিরক্ত করতে আসো তোমাকে সুদ্ধ ফাইন করবো। তলে তলে তুমিও শয়তান কম নও।'

বললাম, 'সে তো বটেই। কিন্তু ফাইন তুলে না দিলে সেক্‌সনের কাজ আজ বন্ধ থাকবে।'

ডসন দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌লেন, 'বটে!'

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললুম, 'হ্যাঁ।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ডসন এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, 'আচ্ছা ভট্টাচারিয়া, ব্লাডি বুড়োটা তোমাকে কিসের লোভ দেখিয়েছে বলো দেখি? ঘরে ওর বুড়ী স্ত্রী ছাড়া আর কে আছে?'

বললুম, 'সতের বছরের অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়েও আছে, জানো না বুঝি ?'

তারপর সেক্‌সনে ফিরে গেলুম।

কাজ চলছে না শুনে ক্যাপ্টেন সাহেব স্বয়ং আবার দেখা দিলেন। বললেন, 'সারবন্দী হয়ে দাঁড়াও। ব্যাপারটা আমি সব শুনতে চাই।'

যখন চরমতম অবজ্ঞাই আমরা করতে প্রস্তুত হয়েছি, তখন কৌতুকচ্ছলেও এ সব ছোট খাটো আদেশ মানবার অভিনয় করা যায়। এতক্ষণ গোল হয়ে যারা জোট পাকাচ্ছিল, সবাই আমার ইঙ্গিতে একই সরল রেখায় সমান্তরাল ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়াল। প্রথমে আমি, তারপর চাটুয্যে এবং পাশাপাশি আমাদের সেক্‌সনের আরও জন পঁচিশেক এগ জামিনার।

সাহেব প্রথমে আমার সম্মুখেই এসে দাঁড়ালেন। পাইপটা ঠোঁটের এক কোণে সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'কি চাও তুমি ?'

আমি বললুম, 'আমি নয়—আমরা।'

'বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই। তুমি কি চাও তাই বল। কাজ করছ না কেন ? এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে ?'

বললুম, 'আমাদের সম্মানিত চাটুয্যে মশাইকে অন্যায়ভাবে গালাগালি এবং ফাইন করা হয়েছে। আর তার প্রতিবাদেই কাজ বন্ধ আছে।'

সাহেব বললেন, 'কিছুই অন্যায় হয় নি। তুমি কাজ করবে কি না তাই বল ?'

'ফাইন এবং গালাগালি প্রত্যাহার না করলে কাজ করা অসম্ভব।'

সাহেব বললেন, 'বেশ। তোমাকে ডিস্‌চার্জ করলুম। ডসন, একে একটা গেট-পাশ লিখে এখনি ডিপোর বার ক'রে দাও।'

তারপর চাটুয্যের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বুড়ো বদমাস, এ সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে ?

চাটুয্যে বললেন, 'আজ্ঞে আজ্ঞে—

'আজ্ঞে আজ্ঞে নয়, বল কাজ করবে কি করবে না।'

চাটুয্যে বললেন, 'আজ্ঞে করব।'

'তা হ'লে বাকেট তুলে নাও হাতে।'

চাটুয্যে বাকেট তুলে টিপতে আরম্ভ করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই তাঁর অনুসরণ করল।

ক্যাপ্টেন প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—এইতো গুড বয়ের কাজ। কিন্তু যতক্ষণ সময় নষ্ট ক'রেছ ছুটির পর ততক্ষণ থেকে এই কাজ সেরে দিয়ে যেতে হবে। সে জন্য কোন ওভার-টাইমের ব্যবস্থা হবে না— আগেই বলে রাখছি।'

ডসন তাড়া দিয়ে বললেন, 'এসো ভট্টাচারিয়া, ওদের কাজ করতে দাও।'

ডসনের পিছনে আসতে আসতে চাটুয্যের গলা শুনতে পেলাম, 'আরে বাবা, ওটা স্থান মাহাত্ম্য। প্রথমে দাঁড়ালে ভট্টচায্ যা বলেছে— আমিও ঠিক তাই বলতুম, আর ভটচায্ যদি আমার জায়গায় দাঁড়াত তা'হলে তার ফলাফল দেখে ভটচায্ও ঠিক তোমাদের মতই একটা ক'রে বাকেট হাতে তুলে নিত। নেতাগিরি জিনিসটাই আসলে এই। নেতা কেউ নিজের ক্ষমতায় হয় না অবস্থা গতিকে ধ'রে বেঁধে একেকজনকে নেতা আমরা বানিয়ে বসি। সেটা তার কপাল জোরও বটে, গ্রহবৈগুণ্যও বটে।'

ভক্তদের মধ্যে দু'একজন বলল, 'ঠিক বলেছেন চাটুয্যেদা! অবিকল তাই।'

আর সকলে চুপ ক'রে রইল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ডসনের বুঝি অনুকম্পা হলো। বললেন, 'ঘাবড়িয়োনা ভট্টাচারিয়া—আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

তোমাকে আমি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি ভারী ভালো মানুষ!'

আমি শক্ত হয়ে বললুম, 'ওসব বাজে কথা রাখো। গেট-পাশটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি যাই।'

ডসন বললেন, 'অত নিষ্ঠুর হচ্ছ কেন ডার্লিং? একটু দাঁড়াও—আমি এক্ষুনি সব ঠিক ক'রে দেব।'

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'পাগলামি কোরো না ডসন।' ডসন যেতে যেতে বললেন,'পাগলামি তুমি নিজে করছ ভট্টাচারিয়া, বাড়ীতে তোমার অনেক ডিপেনডেণ্ট আছে, তুমি নিজেই তো সেদিন বলছিলে।'

তা আছে। আগের দিন লেট হয়েছিলাম ব'লে আজ রাত সাড়ে-তিনটায় চুপিচুপি উঠে জ্বর গায়ে উনুনে আঁচ দিতে বসেছিল সুমিতা। আমার নিষেধ শোনে নি। খোকাটার এমন স্বভাব হয়েছে—এক মুহূর্তও মার কোল ছাড়া থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে উঠে গিয়েছিল সুমিতার পিছনে পিছনে। রোজ ওর কান্নায় আমার ঘুম ভাঙে। মন্দ হয় নি, বেশ একটা এ্যালার্মওয়ালা ঘড়ীর কাজ চলে। উঠে বাইরে যাওয়ার সময় একবার সুমিতার মুখের দিকে চোখ পড়েছিল। জ্বরে আর আগুনের আঁচে মুখখানা আরক্ত।

'দেখছ কি' সুমিতা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল।

'কিছু না। আজও আবার জ্বর এলো নাকি?'

সুমিতা অদ্ভুত একটু হেসেছিল, 'আসুক না! জ্বর এলে আমাকে নাকি আরো সুন্দর দেখায়?'

বেরুবার মুখে একবার একটু ইতস্তত ক'রে বলেছিল, 'পয়সায় যদি কুলোয় একটা বেদানা আনবে। তারপর একটু হেসে বলেছিল, সুন্দরের দর্শনী লাগে।'

ডসন ফিরে এসে বলল, 'ঠিক ক'রে এসেছি। আজ কয়েক

খাটার জন্য সস্পেণ্ড। ওটুকু কেবল ক্যাপ্টেনের সম্মান রক্ষার জন্য। শত হ'লেও ক্যাপ্টেন তো। কাল সকাল থেকে আবার কাজে লেগে যেও।'

একটু ইতস্তত করলাম। চাটুয্যের কথাকেই সত্য হ'তে দিলাম তাহ'লে? পরের মুহূর্তে ভাবলাম, ক্ষতি কি? ওদের মত লোকের কাছে আবার চক্ষুলজ্জা? বরং ওদের ব্যবহারের জবাব চাকরি নিয়ে ওদের ওপর সর্দারি ক'রেই দিতে হবে। সুমিতার জন্য একটা বেদনা, আর খোকনের জন্য কিছু লজেঞ্চ নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

সন্ধ্যার পর কড়া নাড়ার শব্দে দোর খুলে এসে দাঁড়ালাম। চাটুয্যে, রমেশ, অতুল এবং আরও জন বারো। ব'ললাম, 'কি ব্যাপার?'

চাটুয্যে এগিয়ে বললেন, 'তোমার স্ত্রী কেমন আছেন ভটচায্, তাঁর অসুখের কথা শুনেছিলাম।'

বললাম, 'ভালোই আছেন।'

রমেশ পকেট থেকে একটা বেদানা বার করল। প্রসঙ্গক্রমে বেদানার কথাটা তাকে বলেছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোথায় সস্তায় পাওয়া যায়।

চাটুয্যে বললেন, 'তুমি আমাদের মুখ রেখেছ ভটচায্। সবারই প্রাণের কথা বলেছ, উপযুক্ত কাজ করেছ তুমি। চাকরি! থুঃ থুঃ, ও আবার একটা চাকরি! তোমার মত বিদ্বান সচ্চরিত্র ছেলের আবার চাকরির ভাবনা? সার্টিফিকেটখানা একবার মেলে ধরলে অমন হাজারটা আপিস এসে তোমাকে লুফে নেবে না?'

একটু শুষ্ক হেসে বললাম, 'তার দরকার হবে না। সাহেবকে অনুরোধ ক'রে ঐ আপিসেই আবার কাজ পেয়েছি চাটুয্যে মশাই। ভাবনা নেই, কালই গিয়ে আবার আপনার গল্প শুনতে পারব।'

চাটুয্যে বললেন, 'যাঃ, ঠাট্টা করছ! তুমি আবার তাই পার নাকি?'

বললাম, ঠাট্টা নয় সত্যি, আপনারা পারলেন—আমি কেন পারব না?'

চাটুয্যে সে কথার কোন জবাব না দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি?' আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।'

নীরস এবং নির্মম কণ্ঠে বললাম, 'না হ'লে আর উপায় কি।'

চাটুয্যে এক মুহূর্ত চুপ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'না উপায় আর কি। চল হে রমেশ চল, রাত হলো।'

চাটুয্যের পিছনে সদলবলে সবাই আবার হাঁটা শুরু করল।

ওরা কি সত্যিই আমার কাছে অন্য কিছু আশা ক'রেছিল? সত্যিই দেখতে এসেছিল, ওরা যা পারেনি আমি তাই পেরেছি? উইলসন আর ডসনের চেয়েও কি আমি ওদের বেশী নিরাশ আর বেশী অপমান করলুম?

চোর

ঘরে ঢুকে গা থেকে চাদরটা খুলে অমূল্য বিছানার ওপর রাখল, তারপর পকেট থেকে সরু লম্বা সাইজের একটা সাবানের বাক্স আর এক কৌটো স্নো বার ক'রে স্ত্রীর সামনে ধ'রে বলল, 'নাও, তুলে রাখো।'

রেণু হাতখানা বাড়িয়েই তাড়াতাড়ি আবার সরিয়ে নিল, যেন সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল সে। তারপর সরাসরি স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ আবার এ-সব এনেছ যে!'

অমূল্য একবার যেন চোখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু পর-মুহূর্তেই তীব্র দৃষ্টিতে রেণুর দিকে চেয়ে ক্রোধ এবং ব্যঙ্গ-মিশ্রিত অদ্ভুত হাস্যে বলল, 'এনেছি বাজারে বিক্রি করবার জন্যে।

সঙ্গে সঙ্গেই সুর বদলে হঠাৎ যেন ধমকে উঠল অমূল্য, 'বলি, জিনিসগুলি হাত থেকে নিতে পারবে কি না?'

রেণু আস্তে আস্তে বলল, 'হাতে করে তুমি যদি আনতে পেরে থাক, আমি নিতে পারব না কেন?'

এর পর জিনিসগুলি তুলে নিয়ে রেণু জল-চৌকিটার ওপর রেখে দিল।

অমূল্য বলল, 'শেষ পর্যন্ত না নিয়ে যখন পারবেই না জানো, তখন আগে থাকতে ভদ্রভাবে নিলেই হয়। অত চেঁচামেচি অত সতীপনা কিসের জন্যে? আর একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম বলে কি রোজই তাই করব না কি। এগুলি আমার নিজের পয়সায় কেনা।'

রেণু স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসল, 'দেখ আর যাই কর, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলো না।'

অমূল্য আবার জ্বলে উঠল, 'না খড়দ'র মা-গোঁসাই এসেছ কি না তুমি, তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলব না !'

এবার সত্যি সত্যিই হাসি পেল রেণুর, 'খড়দ'র মা-গোঁসাই ছাড়া আর কারো কাছে বুঝি সত্যি কথা বলা যায় না ?'

অমূল্য এক মুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল। হাসলে ভারী সুন্দর দেখায় ওকে, কেবল এই গোঁড়ামিটুকু যদি না থাকত, এই অতিরিক্ত শুচিবায়ু।

রেণু একবার চোখ নামিয়ে নিল, তারপর আবার অমূল্যের দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'দেখ, তোমার ভালোর জন্যই বলি, না হ'লে আমার আর কি, একদিন যদি হাতে হাতে ধরা প'ড়ে যাও তখন দশা হবে কি, তখন মান থাকবে কোথায় ?'

অমূল্য অটুট আত্মপ্রত্যয়ে বলল, 'ক্ষেপেছ ! তেমন কাঁচা হাত আমার নয় !'

হাত কাঁচা নয়, এই নিয়ে বড়াই করতে লজ্জাও হয় না অমূল্যর, সেই লজ্জায় রেণুর নিজের মরে যেতে ইচ্ছা করে। হাত কাঁচা নয় তা ঠিক। কোন যেন দ্বিধা নেই অমূল্যর ! বিয়ের ক'দিন পরে তারা ট্রামে যাচ্ছিল ইডেন গার্ডেন দেখতে। এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসে রেণুর সঙ্গে গল্প করছিল অমূল্য। কন্‌ডাক্টর এলো টিকিট চাইতে। সঙ্গে সঙ্গে গল্পে অমূল্যর মনোযোগ আরও বেড়ে গেল।

কন্‌ডাক্‌টর তবু জিজ্ঞেস করল, 'বাবু, টিকিট ?'

অমূল্য একবার মাথা নেড়ে রেণুর সঙ্গে গল্পই করতে লাগল। রেণু স্পষ্ট দেখল, কন্‌ডাক্টরটা একটু মুচকি হেসে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। অমূল্য অনর্গল কথা বলতে লাগল কিন্তু লজ্জায় রেণুর সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। ছি ছি, কি মনে করল কন্‌ডাক্টরটা ! মাত্র দু'আনার তো ব্যাপার।

কন্‌ডাক্টর একটু দূরে স'রে গেলে রেণু চুপে চুপে স্বামীকে জিজ্ঞেস ক'রেছিল, 'টিকিট করলে না যে !'

অমূল্য হেসে বলেছিল, 'ওঃ, তুমি বুঝি আবার তা লক্ষ্য ক'রেছ! টিকিটই যদি করব তো ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছি কেন!'

রেণু অবাক হয়ে বলেছিল, ওমা, ফার্স্ট ক্লাসে ছাড়া আবার ভদ্রলোক মেয়ে-ছেলে নিয়ে ওঠে না কি। তাই ব'লে টিকিট করবে না?

অমূল্য সগর্বে বলেছিল, 'একা যখন উঠি তখনই ডবলু টিতে চলি, আর আজ তো তুমি সঙ্গে আছ। বিয়ে করায় বড্ড খরচ। দু'-চার পয়সাও যদি এ ভাবে পুষিয়ে না নেওয়া যায় তা হ'লে কি ক'রে চলে বল।'

রেণু ভেবেছিল, অমূল্য বুঝি পরিহাস করছে। কিন্তু ফেরার পথেও অমূল্য যখন কনডাক্টরকে দেখে গম্ভীর মুখে একবার মাথা কাত ক'রে রেণুর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল, তখন রেণুর বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ করছে। রক্ষা যে, সেই আগের কনডাক্টার নয়। এবার সে তা হ'লে অমূল্যর কাছ থেকে টিকিটের পয়সা আদায় ক'রে তবে ছাড়ত। ছি ছি ছি! এক-গাড়ী লোকের সামনে কি ক'রে তাদের মান থাকত, কি ক'রে মুখ দেখাত তারা!

গাড়ী থেকে নেমে রেণু বলেছিল, ছি, এ-সব আমি মোটেই পছন্দ করিনে।'

অমূল্য বলেছিল, 'কি সব?'

'এই টিকিট না কেটে ট্রামে বাসে চলা, ছি।'

অমূল্য হেসেছিল, 'ও, গম্ভীরভাবে তুমি বুঝি সেই কথাই ভাবছ। আচ্ছা শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে তো হে তুমি! বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ভোগাবে। হিষ্ট্রীয়া টিষ্ট্রীয়া নেই তো আবার?'

'কেন? তার মানে?'

'তার মানে এ সব মেয়েদের তাও থাকে।'

রেণু বলেছিল, 'ছি, সামান্য দু' আনার পয়সার জন্য—'

অমূল্য বাধা দিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'দু' আনা নয়, দু' আনা দু' আনা, চার আনা, দিব্যি এক প্যাকেট সিগরেট হবে।'

'চাইলে না কেন, সিগরেটের পয়সা আমি তোমাকে দিতাম।'

এর ক'দিন পরে অমূল্য দামী একখানা চিরুণী নিয়ে এসে উপস্থিত। 'দেখতো, কেমন চিরুণীখানা!'

রেণু সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে চিরুণীখানা নিয়ে বলল, 'বাঃ, চমৎকার তো! কত দাম?'

অমূল্য বলল, আড়াই টাকা।'

রেণুর মুখ ম্লান হয়ে গেল, 'ছি, এত দাম দিয়ে কেন আনতে গেলে বলো দেখি, চিরুণীর তো আমার অভাব নেই, এই সে দিন বৌভাতেই তো তিনখানা চিরুণী পেয়েছি। যা-ই বলো, এ সব বাজে বাবুগিরি আমার মোটেই পছন্দ হয় না, যে দিন-কাল, তাতে এ ভাবে পয়সা নষ্ট করবার কোন মানে হয়?'

অমূল্য আত্মপ্রসাদে হেসে বলল, 'পাগল হয়েছ! গাঁটের পয়সা ব্যয় ক'রে বাবুগিরি করতে যাব, অত পয়সা পাল ব্রাদার্স দেয় না।'

রেণু বলল, 'ও, কোম্পানী বুঝি নিজেদের লোক ব'লে খুব সস্তায় দিয়েছে!'

অমূল্য হেসে বলল, 'কেবল সস্তায় নয় হে, একেবারে বিনামূল্যে। জানে কি না, আনকোরা নতুন বৌ এসেছে ঘরে।'

রেণু সলজ্জে বলল, 'যাও, কি যে বল। মুখের তোমার কোন আগল নেই। সত্যি, আড়াই টাকার জিনিস কত দামে পেলে বল না, আমার বৌদির জন্য একখানা আনাব।'

অমূল্য অকস্মাৎ চটে উঠল, 'হয়েছে। আর ন্যাকামী কোরো না, মেয়েদের ন্যাকামী কখনো কখনো ভালো লাগে, তাই ব'লে কি সব সময়েই সহ্য হয়?'

'তার মানে?'

'তার মানে পয়সা লাগেনি, হাত সাফাইতে এসেছে। তা তোমার জন্যে পারি ব'লে তোমার বৌদির জন্যেও পারতে হবে এমন কি কথা আছে?'

কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে রেণু বলেছিল, 'ও চিরুণীতে আমার কাজ নেই। ওটা তুমি কালই ফেরৎ দিয়ে এসো, ছি।'

'অমনি রাগ হয়ে গেল বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার বৌদির জন্যেও একখানা হবে। হাজার হ'লেও শালাজ তো!'

কিন্তু বহুক্ষণের মধ্যে রেণু আর কথা বলেনি।

আজও রেণু চুপ ক'রে রইল। কোন ভদ্রলোকের ছেলে যে এ-সব করতে পারে, তা যেন ধারণায় আনা যায় না। গরীব তো তার বাপ-ভাইও। কিন্তু পরম শত্রুও কি কোন দিন বলতে পারবে যে, পরের কোন জিনিস লুকিয়ে আনা তো দূরের কথা, হাত দিয়ে ছুঁয়ে পর্যন্ত তারা দেখেছে?

নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে কান্না পায় রেণুর। শেষ পর্যন্ত এমন লোকের হাতেই পড়তে হলো তাকে। আর শুধু হাতে পড়া নয়, আজীবন এই লোকটির সঙ্গেই তাকে বাস করতে হবে, হাসতে হবে, আদর-সোহাগ করতে হবে। তারপর ছেলে হবে, মেয়ে হবে, কিন্তু কিছুতেই অমূল্যর প্রবৃত্তি আর বদ্‌লাবে না। কেন না, এ সব অভ্যাস মানুষের যায় না, বয়স হোলেও না, পয়সা হোলেও না,—রেণু অনেক শুনেছে, অনেক দেখেছে। তারপর সব একাকার হয়ে যাবে; কেউ জানবে না রেণু অন্য প্রকৃতির মেয়ে, এ সব সে সহ্য করতেই পারে না। কেউ কি এ কথা বিশ্বাস করবে? সবাই জানবে অমূল্য যেমন ছিঁচকে চোর, রেণু তেমনি চোরের বৌ।

অন্ধকারে স্বামীর ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের মধ্যে ঘৃণায় রেণুর যেন সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত হয়ে এলো। এমন একটি লোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে যার মন ছোট, প্রবৃত্তি ছোট, পরের দোকান থেকে জিনিস চুরি ক'রে আনতে যার কোন লজ্জা-ঘৃণার বালাই নেই।

অমূল্যর চুম্বনের প্রত্যুত্তরে রেণু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'আমার একটা কথা শুনবে?'

'কি?'

রেণু বলল, 'ও-ভাবে জিনিসপত্র আর এনো না। সত্যি বলছি, ও-সব আমার কিচ্ছু দরকার নেই, আমি আর কিচ্ছু চাইনে; কেবল তুমি ভালো হও, ভদ্র হও। দশ জনে যদি তোমাকে ভদ্রলোক ব'লে জানে, তাহ'লেই আমার তৃপ্তি।'

এবার স্তব্ধ হবার পালা অমূল্যর। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে সে পাশ ফিরলো। এই নীতি-শিক্ষার দক্ষিণা রেণুকে পুরোপুরি ভাবে না দিয়ে তার শান্তি নেই।

রেণু বলল, 'ও কি, রাগ করলে না কি? তোমার ভালোর জন্যই বলছি।'

অমূল্য জবাব দিল, 'আমিও ভালোর জন্যই বলছি। চুপ করে ঘুমোও।'

পরদিন ভোরে উঠে অমূল্য স্ত্রীকে কাছে ডাকল, 'এই শোন।'

রেণু কাছে এসে বলল, 'কি।'

অমূল্য ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'ওপরের বিনোদ বাবুদের ঘরে কাল নতুন কতকগুলি কাঁসার বাটি এসেছে, না?'

রেণু অবাক্ হয়ে বলল, 'হ্যাঁ', তাতে তোমার কি!'

'বিনোদ বাবুদের বৌয়ের সঙ্গে তো তোমার খুব ভাব। ও-ঘরে তো তোমার অবাধ গতিবিধি।'

'হ্যাঁ, মাসীমা ভারি ভালোবাসেন আমাকে। আর তাঁর ছোট ছেলে তো আমার হাতে ছাড়া খেতেই চায় না।'

অমূল্য তেমনি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'তবে তো আরও সুবিধে। দুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে কাপড়ের তলায় ক'রে বাটিটা অনায়াসে তুলে আনতে পারবে।'

রাগে এবং দুঃখে মুখ দিয়ে রেণুর কিছুক্ষণ কথা সরলো না।

একটু পরে সে বলল, 'কি যা তা বলছ, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ?'

অমূল্য অম্লান মুখে বলল, 'মোটেই না, কাঁসার আজকাল সের কত ক'রে জানো ? দু'-তিনটে বাটি যদি সরাতে পারো তাহ'লে দু'দিন বক্সে বসে দু'জনে বেশ থিয়েটার দেখে আসতে পারব।' অমূল্য হাসল।

রেণু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'যেমন মানুষ, তেমন তার ঠাট্টা। ও-সব ঠাট্টা আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।'

অমূল্য বলল, 'ঠাট্টা নয় সত্যিই বলছিলাম।'

দুপুরবেলায় মাসীমার কোলের ছেলেকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে অকারণে রেণুর হাত কাঁপতে লাগল। কি সাংঘাতিক মানুষ অমূল্য, কি বিশ্রী ঠাট্টাই সে করতে পারে!

কয়েক দিন পরে। বেলা সাড়ে সাতটা বাজে। কিন্তু বিছানা থেকে অমূল্যর ওঠার নাম নেই, অন্য দিনে চা-টা খেয়ে এর মধ্যে অমূল্য রওনা হয়ে পড়ে। দোকানে আটটা থেকে তার ডিউটি।

রেণু কাছে এসে অমূল্যর মুখের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'কি মশাই, খুব যে ঘুমনো হচ্ছে ? বেলা হয় না আজ ?'

অমূল্য অদ্ভুত একটু হাসল, 'আজ আর বেলা হবে না।'

স্বামীর হাসি আর কথার ভঙ্গিতে কেমন যেন বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল রেণুর ; বলল, 'কেন, দোকান আজ বন্ধ না কি ? কি উপলক্ষে বল দেখি ?'

অমূল্য চটে উঠে বলল, 'ন্যাকা। কি উপলক্ষে! উপলক্ষ আবার কি, উপলক্ষ আমার শ্রাদ্ধ।'

বলতে বলতে অমূল্য আবার পাশ ফিরতে চেষ্টা করল।

রেণু এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এমন যে হবে আমি আগেই জানতুম।'

অমূল্যর আর পাশ ফেরা হলো না, 'কি, কি বললে ?'

রেণু বলল, 'বলবার আর আছে কি, তবু ভাগ্য যে, পুলিসে দেয়নি। অমনিই ছেড়ে দিয়েছে।'

অমূল্য বলল, 'উঃ কি আপশোষের কথা! কিন্তু এর চেয়ে বোধ হয় পুলিসের হাতে যাওয়াই ভালো ছিল। আমি জেল খাটতুম আর তুমি তত দিন সাধুসঙ্গ ক'রে একটু মুখ বদলে নিতে পারতে।'

কিছুক্ষণ বাদে মনে মনে কি মতলব ঠিক ক'রে অমূল্য উঠে পড়ল। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখে রেণু দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ দিয়ে বসে আছে।

অমূল্য কাছে এসে বলল, 'বা, অমন ক'রে বসে রয়েছ যে! হলো কি তোমার ?'

কিন্তু রেণুর কাছ থেকে কোন সাড়া এল না।

অমূল্য বলল, 'বা, মুখই তুলবে না ব'লে ঠিক ক'রেছ না কি ? কিন্তু মুখ দেখাতে লজ্জা তো আমার হবার কথা, তোমার কি ?

রেণু হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'তোমার প্রাণে কি মায়া-মমতা বলতে কিছু নেই একেবারে ? তুমি কি পাষাণ ?'

অমূল্য পাষাণ নয়। নীরবে আস্তে আস্তে রেণুর চুলের ওপর হাত বুলাতে লাগল।

মিনিট খানেক পরে রেণু মুখ তুলে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি এমন অপরাধ ক'রেছিলে যে ওরা তোমাকে ছাড়িয়ে দিল ?'

কৈফিয়ৎটা অমূল্যর কাছে নয়, অমূল্যর মনিবদের কাছেই যেন দাবী করছে রেণু। অমূল্য একটু অবাক্ হয়ে গেল। বলল, 'অপরাধ আবার কি। বুড়ো ক্যাসিয়ার বেটা পিছনে লেগেছিল। অপরাধ তার স্ত্রীর জন্য কেন এক কৌটো পাউডার হাত-সাফাই ক'রে নিয়ে দিতে পারিনি। ম্যানেজারকে গিয়ে লাগিয়েছে আমার বিরুদ্ধে।'

রেণু আজ স্বামীর কথার প্রতি বর্ণ বিশ্বাস ক'রে বলল, 'হুঁ, সাধু যে পৃথিবীতে সকলেই তা জানা আছে।'

দিন কয়েক খুব চাকরি খুঁজল অমূল্য। কিন্তু হয় হয় ক'রে কোনটাই ঠিক হয়ে উঠল না। রেণু ভরসা দিয়ে বলে, 'অত ভাব কেন, চাকরির কি অভাব আছে না কি আজকালকার দিনে? হবেই এক দিন।'

কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই চাল বাড়ন্ত হয়ে পড়ল। শুধু চাল নয়, তেল, নুন, ডাল বলতে কিছুই নেই।

অমূল্য মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'এক কাজ করা যায়, কিন্তু তুমি কিছু মনে করবে না তো?'

'না, মনে আবার কি করব?'

'স্নো আর সাবানের বাক্সগুলি দাও। জানা লোক আছে। উচিত দামেই দিয়ে দিতে পারব।'

রেণুর মুখখানা হঠাৎ যেন কালো হয়ে উঠল। তারপর বলল, 'আচ্ছা নাও। কিন্তু এ ভাবেই তো আর দিন চলবে না!'

অমূল্য বলল, 'সে তো নিশ্চয়ই। অন্য ব্যবস্থাও করতে হবে।'

দু'-তিন দিন পরে দেখা গেল, অমূল্য কোত্থেকে একটা দামী ফাউণ্টেন পেন নিয়ে এসেছে।

রেণু একবার পেনটার দিকে তাকাল, আর একবার স্বামীর দিকে তাকাল। অমূল্য প্রতি মুহূর্তেই আশংকা করতে লাগল এই বুঝি রেণু তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার ক'রে উঠবে। কিন্তু আশ্চর্য, রেণু ও সম্বন্ধে কোন কথাই বলল না। যেন কোন নতুন কিছু ঘটেনি, তেমনি সহজ নিশ্চিন্তভাবে ঘর ঝাঁট দিতে লাগল।

মাঝখানে একবার স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'নারকেল তেল কিন্তু একেবারে নেই।'

অমূল্য বলল, 'আচ্ছা।'

সন্ধ্যার দিকে পেনটা আর দেখা গেল না। তার বদলে চাল, ডাল, তেল, কয়লায় ঘর ভ'রে গেল। সুগন্ধি নারিকেল তেল এল এক শিশি।

রেণু এবারও কোন কথা না ব'লে জিনিসগুলি গুছিয়ে তুলছে, অমূল্য বলল, 'দাঁড়াও, আর একটা জিনিস আছে তোমার জন্য।'

রেণু বলল, 'কি।'

অমূল্য পকেট থেকে একটা ওটিন স্নো বের ক'রে রেণুর হাতে দিয়ে বলল, 'পাল ব্রাদার্স থেকে একেবারে নগদ পয়সা দিয়ে কেনা। বুড়ো বিষ্টু বাবুর নাকের সামনে পাঁচ টাকার নোটখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, চেঞ্জ প্লিজ! একটু তাড়া আছে বাইরে।'

রেণু হেসে বলল, 'এতও জানো তুমি, আর এতও তোমার মনে থাকে!' রাত্রির অন্ধকারে স্বামীর রোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে রেণু আস্তে আস্তে বলল, 'যাই বলো, আমার কিন্তু গা কাঁপছে এখনো। এত সাহস কি ভালো?'

রেণুর খোঁপার ওপর সাদরে আস্তে একটু চাপ দিয়ে অমূল্য বলল, 'সাহস ভালো নয়? সাহস না থাকলে এত দিন উপোস ক'রে মরা ছাড়া গতি ছিল না কি? তোমার মত ভীরু হলেই হয়েছিল আর কি! আস্তো একটি অকর্মার ধাড়ী। তোমার মত অমন সুবিধা-সুযোগ যদি আমার থাকত!'

অভিমানে কথা ফুটল না রেণুর, ঠোঁট ফুলে উঠতে লাগল বার বার। এর জবাব রেণু স্বামীকে একদিন না একদিন না দিয়ে ছাড়বে না।

দু'-তিন দিন বাদে। সুযোগ তো এসেছে, কিন্তু রেণুর হাত কাঁপে আর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। দেওয়ালের এক কোণে পেরেকে বিনোদ বাবুর হাত-ঘড়িটা ঝুলানো রয়েছে। এমন প্রায়ই থাকে। ভারী ভুলো মন বিনোদ বাবুর। যে দিন আপিসের বেলা বেশী হয়ে যায়, সে দিন আর কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কোন দিন বা ঘড়ি ফেলে যান, কোন দিন মণিব্যাগ।

খাটের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে মাসীমা অচেতনভাবে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর কোলের ছেলেকে দুধ খাইয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিছানায়

শুইয়ে দিল রেণু। নিস্তব্ধ ঘর, ঘড়ির শব্দ এখান থেকেই যেন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, অতটুকু হাতঘড়িতে কি এত শব্দ হয়? না, এ তার নিজেরই হৃৎপিণ্ডের শব্দ! একবার রেণু চেষ্টা করল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু অসম্ভব। এখান থেকে তার নড়বার সাধ্য নেই, পা আটকে গেছে মাটিতে। আর ওই হাতঘড়িটার ছোট ছোট কাঁটা দু'টি তার দু'চোখের তারাকে বিদ্ধ ক'রে রেখেছে।

কিন্তু যদি ধরা পড়ে, যদি খোঁজ পড়ে ঘড়ির। তার রেণু কি জানে? এই ছ' মাস ধ'রে বিনোদ বাবুদের ঘরে সে আসে যায়, গল্প করে, একগাছা কুটো পর্যন্ত নড়চড় হয়েছে কেউ বলতে পারবে?

রেণু যখন কোন রকমে নিজের ঘরে এসে পৌঁছল, তখন অদ্ভুত উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বুক কাঁপছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। এমন আনন্দের স্বাদ অভূতপূর্ব। আর একবার ছোট্ট ঘড়িটা আঙুল দিয়া স্পর্শ ক'রে দেখল রেণু। পুরুষের প্রথম স্পর্শও কি এত তীব্র, এমন রোমাঞ্চকর?

সন্ধ্যার পর অমূল্য ম্লান মুখে ঘরে ফিরে এলো। আজ আর কোন দিকে সুবিধা হয়নি। হঠাৎ রেণুর দিকে চেয়ে অমূল্য অবাক্ হয়ে গেল।

'কি ব্যাপার, আজ যে একটু বিশেষ সাজের ঘটা দেখছি।'

দরজায় খিল দিয়ে এসে রেণু স্বামীর সঙ্গে প্রায় মিলে গিয়ে স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে বলল, 'অত হিংসা কেন, সাজ তোমারও আজ মন্দ হবে না। যদিও কেবল এই রাত্রিটুকুর জন্য। কিন্তু একটা রাত্রিই কি কম?'

অমূল্য ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'কি বলছ, একটু পরিষ্কার ক'রে বল, হেঁয়ালি ভালো লাগে না সব সময়!'

রেণু বলল, 'সবুর, সবুর, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। তোমাদের সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো, একটুও ধৈর্য সয় না প্রাণে, না?'

খাওয়া দাওয়ার পরে আলো না নিবিয়েই স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল রেণু।

অমূল্য অবাক্ হয়ে বলল, 'আলোটা কি সারা রাত জ্বালাই থাকবে না কি আজ ?'

রেণু মুচকি হেসে বলল, 'থাকলই বা, ক্ষতি আছে না কি তাতে ? না গো না, সারা রাত জ্বালা থাকবে না, একটু পরেই নিববে। দেখি, দেখি, বাঁ হাতখানা বার কর দেখি।'

'বাঁ হাত দিয়ে আবার কি করবে।'

'অল্প একটু দরকার আছে।'

ব্লাউজের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে ব্যাণ্ডসুদ্ধ ছোট ঘড়িটুকু বের ক'রে রেণু স্বামীর মণিবন্ধে বেঁধে দিয়ে বলল, 'দেখি তো, কেমন মানাচ্ছে ?'

অমূল্য মুহূর্তকাল অবাক হয়ে থেকে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'কি সর্বনাশ, এ তুমি কোথায় পেলে ?'

রেণু গভীর রহস্যলোক থেকে যেন মৃদু একটু হাসল, বলল, 'তা নিয়ে তোমার দরকার কি, মানাচ্ছে কি না তাই বলো।'

তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে লাইটটা অফ ক'রে এসে রেণু স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। আজ তার কোন কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, দীনতা নেই। আজ সে পৃথিবী জয় ক'রে ফিরেছে।

'কি গো, কথা বলছ না যে ! বলো না, ঠিক মানিয়েছে কি না ?

মানাবারই তো কথা। আজ রেণু তার যথার্থ সহধর্মিণী। এত দিন ধ'রে এই তো অমূল্য প্রত্যাশা ক'রে এসেছে। আজ তার উল্লসিত হয়ে উঠবার দিন। কিন্তু স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির-পরিচিত দু'খানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোন সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ-ক্বণিত মৃণালভুজ নয়, তাও আজ শ্রীহীন, কলঙ্কিত।

মাসখানেক যাবত গৌরাঙ্গ বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রছে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে নিজের ঘরে যাওয়ার আগে চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে চোখ বুলিয়ে নেয়। রাণুকে যদি কোথাও দেখতে পায়, মুখ মুচকে হাসে কিংবা শিস দিতে থাকে আস্তে আস্তে। নিজের বারাণ্ডায় পায়চারি ক'রতে ক'রতে গুন্‌গুন্ ক'রে গায়, 'চোখে চোখে রাখি হায়রে'। রাণু তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। কলের কাছে তাকে বাসন মাজতে কি জল নিতে আসতে দেখলে গৌরাঙ্গ অমনি ঘর থেকে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ায়, তারপর সেখান থেকে আর নড়তে চায় না।

রাণুর বাবা অনাদি দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলে, 'ওকে মেরে যদি হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে না দিই তো কায়েতের বাচ্চা নই আমি।'

রাণুর মা সরমা বলে, 'মারামারির দরকার নেই, এ বাড়ী তুমি ছেড়ে দাও। বাড়ীওয়ালাকে গিয়ে বল, হয় ওরা এখান থেকে উঠুক্ না হয় আমরা।'

গৌরাঙ্গের মা সৌদামিনীর কাছেও নালিশ যায়, 'ছেলেকে ব'লে দিয়ো দিদি, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে তো সেও। একি স্বভাব-চরিত্র। আমরা হ'লে তো লজ্জায় ম'রে যেতাম।'

মনে মনে সৌদামিনীও যে লজ্জিত না হয় তা নয়, কিন্তু স্বীকার করলে ওরা আরো পেয়ে বসবে, সৌদামিনী জবাব দেয়, 'কি জানি, লজ্জায় মরে যাওয়ার মত তো কিছু দেখি না রাণুর মা। পুরুষ ছেলে, সারাদিন খেটে-খুটে এসে হাত-পা ছড়িয়ে একটু আয়েস করবে, নিজের ঘরে বসে গলা খুলে গান গাইবে, তাতে যদি কারো মহাভারত অশুদ্ধ হয়, আমরা নাচার।'

মাঝখানে মাত্র কয়েক হাত উঠানের ব্যবধান। উত্তরের ঘর দু'খানা রাণুদের আর দক্ষিণের দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে গৌরাঙ্গ আর তার মা। একখানা ঘরেই গৌরাঙ্গদের চলত, কিন্তু বাড়ীওয়ালা কিছুতেই শুধু একখানা ভাড়া দিতে চায়নি। আর একখানা আবার কে নেবে?

রাণুকে তার মা-বাবা সাবধান ক'রে দিয়েছে, পারতপক্ষে সে যেন গৌরাঙ্গের সামনে কক্ষনো না বেরোয়। রাণুকে অবশ্য একথা বলে দেওয়া বাহুল্য। সে নিজে থেকেই সাবধান হয়ে চলে। গৌরাঙ্গের কাণ্ড দেখে তার কখনো বা হয় রাগ কখনো বা পায় হাসি। অনুরাগ মুহূর্তের জন্যেও আসে না। আসবার কথাও নয়, কেবল রঙটাই যা গৌরাঙ্গের ফরসা, কিন্তু এই বয়সেই চোয়াল ভেঙেছে, চোখ দুটো কোটরগত, বিড়ি খেয়ে খেয়ে ঠোঁটের রঙ হয়েছে ঘন-কৃষ্ণ। দশ আনি ছ' আনি চুলের ছাঁট, ঠোঁটের ওপর গোঁফ রাখা সূক্ষ্ম রেখায়। এর পর একটা ছাই রঙের স্যুট প'রে বেরোয় কাজে। যা চমৎকার দেখা যায় স্যুট পরলে ঐ-চেহারায়। শুধু বাইরের নয়, লোকটির মনের চেহারাও যে অমনি তা তার হাব-ভাবে আদবকায়দায় রাণুর কাছে গোপন থাকে না। গৌরাঙ্গের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গি প্রতিটি পদক্ষেপ রাণুর দৃষ্টিকে পীড়া দেয়, রুচিকে ক্লিষ্ট ক'রে তোলে। আজই না হয় অবস্থা এমন হয়েছে। কিন্তু কমলাপুরের বনেদী চৌধুরী বংশের তো মেয়ে। এক ঘর জ্ঞাতি এখনো জমিদারি করছে গাঁয়ে।

শুধু এক বাড়ীতে থাকে তাই নয়; একই জায়গায়, একই ইন্‌স্পেকশন ডিপোতে কাজ করে অনাদি আর গৌরাঙ্গ, একই টুলস্ সেক্‌সনে। সৈন্যদের ব্যবহার্য নানা রকম জিনিসপত্রের বাছাই হয় ডিপোর মধ্যে। আটটা থেকে চারটে, তা'ছাড়া ঘণ্টা দুই ক'রে প্রায়ই ওভারটাইম খাটিতে হয়।

সেদিন বাইরে থেকেই শিস দিতে দিতে ঢুকল গৌরাঙ্গ। আর অনাদি বিষণ্ণ মুখে ঘরে গিয়ে তক্তপোষে টান হয়ে পড়ল। রাণু কাছে এসে বলল, 'কি হয়েছে বাবা?'

অনাদি বলল, 'গৌরাঙ্গের ইন্‌ক্রিমেণ্ট হয়েছে।'

রাণু চুপ ক'রে রইল। তার মানে শুধু গৌরাঙ্গেরই হয়েছে।

'আর শুধু ইন্‌ক্রিমেণ্টই নয়, আমাদের সেক্‌সনের হেড একজামিনার ক'রে দেওয়া হল তাকে, তার আণ্ডারে কাজ করতে হবে!'

'আর আপনার?'

'না, আমার হয়নি। কি ক'রে হবে, আমি তো আর স্যুট পরে অফিসে যাইনে, সাহেব দেখলে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াইনে, অনবরত ভুল ইংরেজী আওড়াইনে তাদের সঙ্গে? তা না হলে আর কাজের লোক হলাম কিসে? শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। সারা সেক্‌সনটার মধ্যে গৌরাঙ্গই নাকি সব চেয়ে কাজের লোক। সাহেব আদর ক'রে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেলেন, তাঁর মেমসাহেব এসেছিলেন বেড়াতে, তিনিও হেসে গালে টোকা দিয়ে গেলেন গৌরাঙ্গের। হ্যাণ্ড্‌সেক্ ক'রে বললেন, 'কন্‌গ্রাচুলেশন।'

রাণু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'দরকার নেই আপনার ওখানে চাকরি ক'রে। ওরকম চাকরি আরো কত জুটবে।'

কিন্তু আরো কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে মা বাবার মৃদু আলাপ শুনে রাণু অবাক হয়ে গেল।

অনাদি বলছে, 'ওকে খুসি না রাখলে ইন্‌ক্রিমেণ্ট কোন কালেই হবে না। ওই তো প্রথম রেকমেণ্ড করবে। তা ছাড়া সাহেবরা সত্যিই ওকে খাতির করে। শিগ্‌গিরই বোধ হয় ও সুপারিন্‌টেনডেণ্ট হয়ে যাবে। অমন দেখলে কি হবে স্বয়ং অফিসার ইন্‌চার্জের সঙ্গে ওর দহরম মহরম। ওকে ব'লে প্রমথকেও ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে অফিসে। বছর চৌদ্দ বয়স হল তো প্রমথর, এবারও ফেল করল ফোর্থ ক্লাসে। পড়া শুনো যা হবার হয়েছে। প্রথমে না হয় লেবারার হিসাবেই ঢুকুক, মাস অন্তে তিরিশটা টাকা, আরো এ্যালাউন্স আছে। মেয়ের বয়সও তো কম হয়নি একেবারে, বছর আঠোরো হল, না?'

সরমা বলল, 'বৈশাখে উনিশে পড়েছে। কিন্তু গৌরাঙ্গের স্বভাব-চরিত্রটা একটু কেমন ঠেকে না কি?'

অনাদি বলল, 'পুরুষের আবার স্বভাব-চরিত্র। বিয়ে করলেই সব ঠিক হয়ে' যাবে দেখে নিয়ো। তা ছাড়া ওই রকমই চাই আজকাল, বুঝলে? ফাজিল-ফক্কর না হ'তে পারলে এ যুগে ভাত নেই। আর ভাব-সাব দেখে বুঝতে পারো না, দুজনের মধ্যে বেশ একটা ভালো-বাসাও হয়েছে। আজকালকার এই তো নিয়ম, ভালোবাসার পরে হয় বিয়ে।'

প্রতিবাদ নিষ্ফল। এমন সুযোগ আর মিলবে না। গৌরাঙ্গের কোন দাবী দাওয়া নেই, কোন খরচ পত্রের মধ্যে যেতে হবে না। শুধু শাখা সিঁদুর দিয়ে মেয়ে কেউ পার করতে পারে আজকাল? তাও এমন চাকুরে জোয়ান বয়সের ছেলে। এমন নয় যে বুড়ো দোজবরে বর।

কিছুনা কিছুনা ক'রেও শ'দুয়েক টাকা খরচ হয়ে গেল অনাদির। যাক্, এ-দুশো টাকা উঠে আসতে দেরী হবে না যদি কৃপা হয় গৌরাঙ্গের।

বাসর ঘরে গৌরাঙ্গ বলল, 'বাপরে কি শুচিবাই ছিল তোমার বাপ মার। একটু হাসলে দোষ, একটু তাকালে দোষ।' তারপর হাত ধ'রে রাণুকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'এখন আর কিছুতে দোষ নেই, কি বল, আছে না কি?'

রাণু আড়ষ্টভাবে বলল, 'না।'

'তা জানি, তবে অমন লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে যে? ইশারা ইঙ্গিত কিছুই যেন বুঝতে পারতে না? কচি খুকি আর কি, কিন্তু সত্যিই আমাকে তুমি ভালোবাসো তো?'

মুহূর্তের জন্য মনটা রাণুর দুলে উঠল। এখানে আর কারো সঙ্গে গৌরাঙ্গের প্রভেদ নেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই গা ঘিন-ঘিন ভাবটা আরো কমে যেতে লাগল। তা ছাড়া জোর ক'রেই সেটা সে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। গৌরাঙ্গকেই সে ভালোবাসবে। যতটা সত্যি সত্যি ভালো না লাগল, তার চেয়ে দেখাতে লাগল রাণু অনেক বেশী, এই দেখানটা গৌরাঙ্গকে শুধু নয়, নিজের মা বাপকেও। এমনি ক'রেই অনাদির ওপর সে যেন শোধ তুলবে।

অনাদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে গৌরাঙ্গের হাতে রাণু পান তুলে দেয়, অনাদির সামনেই গৌরাঙ্গের সঙ্গে সে কথা বলে, এতে গৌরাঙ্গের নিজেরই যেন কেমন লজ্জা করে আজকাল।

ক'দিনে সত্যিই পরিবর্তন হয়েছে গৌরাঙ্গের। যখন-তখন শিস্ দেওয়ার, গান গাওয়ার আর প্রয়োজন হয় না, সন্ধানী আবিল দৃষ্টিতে রাণুকে খুঁজবার আর দরকার নেই এখন। রাণু আজ গৌরাঙ্গের নিজেরই ঘরে, যে কোন সময় ডাকলে তাকে পাওয়া যাবে, যে-কোন মুহূর্তে তাকে টেনে নিলেই হল বুকের ওপর। উদ্দাম লোলুপতা গৌরাঙ্গের স্বভাবতই শান্ত হয়ে আসে।

অনাদি স্ত্রীকে বলে, 'দেখেছ, আর তুমি বলেছিলে, রাণুর মত শান্ত গম্ভীর স্বভাবের মেয়ে গৌরাঙ্গকে কি ভালোবাসতে পারবে? এখন কি দেখা যাচ্ছে?'

সরমা মুখ টিপে হাসে, 'ভালইতো, তাতে তোমার দুঃখের কি আছে? মেয়ে জামাই সুখী হয়, ভালোবাসে পরস্পরকে, সেইতো আনন্দের কথা। ওমা, রাণু নাকি, তুই ওখানে কি করছিলি?'

আনন্দে সরমারও বেশ আঘাত লাগল, যখন শোনা গেল, রাণুরা সামনের মাসের প্রথমেই উঠে যাচ্ছে এ বাসা থেকে, আর যাওয়ার আগ্রহটা নাকি রাণুরই বেশী। কি নিষ্ঠুর স্বার্থপর মেয়েটা। এতকাল খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করল যে মা-বাপ, বিয়ে হ'তে না হ'তেই তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক সে চুকিয়ে দিতে চাচ্ছে। তাদের চোখের সামনে থাকাও তার সহ্য হয় না।

গৌরাঙ্গ একটু অবাক হ'ল বটে কিন্তু প্রস্তাবটা রাণুর কাছ থেকে আসায় সে খুসিও হ'ল মনে মনে। তবু মুখে বলল, কিন্তু একটু কেমন কেমন দেখাবে না? এই সেদিন বিয়ে হ'ল, আর আজই যদি আমরা উঠে যাই এখানে থেকে?'

রাণু হেসে বলল, 'বাঃ, সেইতো নিয়ম। বিয়ের পরে মানুষ শ্বশুর বাড়ী যায় গাড়ীতে, জাহাজে, দেশ-দেশান্তর পার হয়ে। আর কি কপাল দেখ আমার, শ্বশুর বাড়ী আর বাপের বাড়ী একই বাড়ীর মধ্যে।'

গৌরাঙ্গ বলে, 'সেইতো ভালো। বিদায়-বিরহ নেই, কান্না-কাটি নেই, কারো সঙ্গেই ছাড়া-ছাড়ি হ'ল না। সবাইকেই পাচ্ছ একসঙ্গে।'

'কই আর পাচ্ছি? ভালো ক'রে খুসি মত কথা বলবার জো নেই তোমার সঙ্গে, পাছে ওদের চোখে পড়ে। আবার ওঘরে গিয়ে দু'দণ্ড যে কথা বলব, কি কাজ-কর্ম ক'রে দেব মার, তার ভরসাও পাই না, পাছে তোমাদের চোখে লাগে।'

গৌরাঙ্গের মুখে একটু ছায়া পড়তেই রাণু মধুর ভঙ্গিতে বলল, 'তা ছাড়া সত্যিই আমার ভারী লজ্জা করে, সবাই ভাবে, কি বেহায়া মেয়েটা!'

গৌরাঙ্গ বলে, 'তুমি যত বেশি বেহায়া হবে, তত আমার ভালো লাগবে। মাঝে মাঝে এমন গম্ভীর হয়ে ওঠো যে আমার একেক সময় ভয় হয়, তুমি হয়তো সুখী হওনি।'

রাণু হাসে, 'তাই নাকি? বিয়ের পর তোমার ভয়ও হয় নাকি আজকাল। আগে তো কোন ভয়ের লক্ষণ দেখতাম না। পারো তো জোর ক'রে ও ঘর থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসো, এমনি ছিল ভাব। কিন্তু এরই মধ্যে তুমি রীতিমত ভীতু আর শান্ত মানুষটি হয়ে উঠেছ। আর আমি ঠিক উল্টো। তোমার স্বভাব আমি পাচ্ছি আর আমার স্বভাব তুমি। শুধু মালা বদল নয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব বদলও হয় নাকি বিয়ের পর?'

গৌরাঙ্গ বলল, 'আমার কিন্তু বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। ভালোই লাগছে শ্বশুর-শাশুড়ীকে। কিন্তু সব চেয়ে বিশ্রী লাগে যখন ওরা তোমাকে টগরী বলে ডাকেন।'

রাণু হাসল, 'আর তোমার মা যখন তোমাকে গোরো বলেন, তখন বুঝি শুনতে খুব ভালো লাগে আমার ?'

সিমলা ষ্ট্রীটে নতুন লাল দোতলা বাড়ীটায় পাশাপাশি দু'খানা ঘর নিল গৌরাঙ্গ। ভাড়া পঁচিশ টাকা। আগের বাড়ীতে ছিল বারো।

সৌদামিনী শুনে শিউরে উঠল, 'বুঝে-শুনে খরচ করিস গোরো, টাকা হাতে এসেছে বলেই কি এমন ক'রে নষ্ট ক'রতে হয় ? তাছাড়া বিয়ে থা ক'রেছিস, ছেলে পুলে হবে, ক্রমেই খরচ বাড়বে, এখন কি আর অমন বে-হিসাবী হবার বয়স আছে ?'

গৌরাঙ্গ হাসে, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে তোমার ভাবতে হবে না, হিসাব আমার ঠিক আছে।'

কিন্তু গৌরাঙ্গকে যেন নেশায় পেয়ে বসেছে। মাইনের চেয়ে উপরির দিকে নজর তার বেশী, আর সেই টাকায় পছন্দমত ক'রে ঘর সাজায়, সাজায় রাণুকে। মাসে খান দুই ক'রে নতুন শাড়ী আসে রাণুর, এম বি সরকারে গহনার অর্ডার যায়। খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, আলনায় প্রায় দুটো ঘরই গৌরাঙ্গ ভ'রে ফেলেছে। সমস্ত পুরানো বাজারটাকে সে যেন তুলে নিয়ে এসেছে ঘরে। দেয়ালে দেয়ালে দেশ-বিদেশের অভিনেত্রীদের বিভিন্ন ভঙ্গির প্রতিকৃতি। সবগুলো রাণুর চোখে ভালো লাগে না। বলে, 'ও-গুলি আবার আনলে কেন ? মাগো, কি বিশ্রী, কি অসভ্য সব ঢঙ, লজ্জাও করে না ?'

গৌরাঙ্গ বলে, 'কেন, হিংসা হয় নাকি তোমার ? সতীন বলে মনে হয় নাকি ?'

গৌরাঙ্গের বুকে মাথা রেখে রাণু বলে, "ঈস, আমার সতীন হ'তে পারে এমন যোগ্যতা আছে নাকি ওর একটারও ?'

রবিবার হয় থিয়েটার না হয় সিনেমা। কোন কোন দিন অবশ্য

ট্রামের অলড়ে কেটে সমস্ত কলকাতাটা গৌরাঙ্গ আর রেণু চষে বেড়ায়।

গৌরাঙ্গের চেষ্টায় রাণুর ভাই প্রমথর চাকরি হয়ে গেছে তাদের ডিপোতে। খবরটা দিয়ে গৌরাঙ্গ বলে, 'কি খাওয়াবে বলো।' গৌরাঙ্গ অর্থপূর্ণভাবে হাসে। রাণুও হাসে, 'এত লোকের এত চাকরি দিচ্ছ, আমাকে দাওনা একটা জুটিয়ে।'

গৌরাঙ্গ বলে, 'রাণীরও বুঝি মাঝে মাঝে চাকরাণী হবার সাধ যায়? এত বড় চাকর দিনরাত যার ফুট ফরমাস খাটে পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী ছাড়া আর কোন্ পদ তাকে দিতে পারি বলো?'

সম্রাজ্ঞী ছাড়া কি, শাশুড়ী কেবল নাম মাত্র। ঘরের সমস্ত কর্তৃত্ব গৌরাঙ্গ তার হাতে তুলে দিয়েছে। কারো সংসারে এখন আর বোঝা হয়ে নেই রাণু। এখানে তাকে না হলেই বরং গৌরাঙ্গের এক মুহূর্ত চলে না। তার সামান্য একটু মাথা ধরলে গৌরাঙ্গের মনে উৎসাহ থাকে না, কোনদিন একখানা ময়লা শাড়ী তাকে পরতে দেখলে সমস্ত পৃথিবীর রঙ গৌরাঙ্গের কাছে বিবর্ণ হয়ে যায়। তার স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য গৌরাঙ্গের সমস্ত কর্ম প্রেরণায় মূল উৎস।

শুধু মাইনের কটা টাকায় যে এমন রাজার হালে কেউ থাকতে পারে না তা রাণু বোঝে। প্রথম প্রথম তার মনে কেমন একটু খচ্‌খচ্ করত চিন্তাটা। কিন্তু গৌরাঙ্গ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে এতে কোন দোষ নেই। কোন গরীব অনাথের সর্বনাশ তো আর করছে না গৌরাঙ্গ। একদিকে বড় বড় কোম্পানী যারা যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে আর একদিকে সরকার। দু'একশ টাকা মারলে কোন পক্ষকেই পথের ভিখিরী করা হবে না। যুদ্ধ জয় ক'রতে হলে কি আর খরচের দিকে অত কড়া নজর রাখলে চলে?

সেদিন লাইটহাউসে একটা ইংরেজী বই দেখতে গেল গৌরাঙ্গ আর রাণু। যদিও ইংরেজী কেউ ভালো ক'রে বুঝতে পারে না, কিন্তু

বোঝাটাই তো আর সব সময় আসল কথা নয়। অমন হাউস, অমন দামী সিটে সাহেব-মেমের পাশাপাশি বসে ছবি দেখার মধ্যে অপূর্ব উন্মাদনা আছে।

কি যোগাযোগ! পাশেই বসেছে মিঃ গোয়েন, গৌরাঙ্গদের সুপারিন্‌টেনডেন্ট। রাণুর দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে এক চোখ বুজে গোয়েন বলল, 'হ্যালো, সেহানবীশ, এমন খাসা জিনিস জোটালে কোত্থেকে হে!'

গৌরাঙ্গ মিশ্র ইংরাজী বাংলায় জবাব দেয়, 'চুপ চুপ, মাই ওয়াইফ, মাই ওয়াইফ।'

গোয়েন বলে, 'বটে! বেশ, বেশ, আলাপ করিয়ে দাও না।'

গৌরাঙ্গ জবাব দেয়, 'ভেরি সরি। একেবারেই ডাম্ব ক্রিচার। কথা বলতে পারে না, নাহলে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব তাতে বাধা কি?'

গোয়েন হাসে, 'সত্যি? কিন্তু বোবাদের কি ক'রে কথা বলাতে হয় আমি জানি।'

গোয়েন জাতে ইহুদি। দু'তিন পুরুষ আছে কলকাতায়। বাঙালীদের সঙ্গে কাজ ক'রে দু'চার পদ বাংলাও বেশ বলতে পারে। দারুণ চৌকস লোক। ডাইনে বাঁয়ে ঠিক রাখে। রেস, ওয়াইন, ওম্যান। আর জমার ঘরে জাল, জুয়াচুরি, ঘুষ। প্রয়োজন হ'লে ঘুষি চালাবার জোরও আছে কব্জিতে। গৌরাঙ্গের এক ধাপ ওপরে তার পদ। কিন্তু তার সঙ্গে সহকর্মীর মতই ব্যবহার করে। বখরার আধা আধি না হলেও চার ছ'আনি অংশ গৌরাঙ্গকে সে দেয়। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে গোয়েনের অতখানি কার্পণ্য নেই। আমোদ প্রমোদের খরচ গোয়েন সম্পূর্ণ নিজেই জোগায়। নিজের মুখের পানপাত্র গৌরাঙ্গের সামনে সে তুলে ধরে। আর শুধু পানপাত্রের মধ্যেই তার উদারতা সীমাবদ্ধ থাকে না। গোয়েন বলে এসব জিনিস একা একা উপভোগ করবার নয়। সঙ্গী না থাকলে এদের পুরোপুরি রঙ্‌ খেলে না।

গোয়েন আরও কয়েকবার ফাঁকে ফাঁকে রাণুর দিকে তাকায়। রাণু চোখ ফিরিয়ে নেয়। ওরকম ক'রে তাকায় কেন হতভাগা? ওর চোখের দৃষ্টি ঠিক আগেকার গৌরাঙ্গের মত। রাণুর বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে ওঠে। গৌরাঙ্গের সঙ্গে সাহেব ইংরেজীতে আলাপ করে। কথা বলবার সময় মাঝে মাঝে কি একটা উগ্র গন্ধ আসে। কি বিশ্রী গন্ধ। নিশ্চয়ই মদ খেয়ে এসেছে।

'আমাকে বোবা বললে কেন? ডাম্ব মানে যে বোবা তা আমি জানি।' রাণু স্বামীকে বাড়ী এসে বলে।

গৌরাঙ্গ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়, 'কিন্তু গোয়েন মানে যে সয়তান তা জানো না।'

গৌরাঙ্গ অবশ্য ভালো করেই জানে। কিন্তু জানলেই কি আর সব সময় মানতে পারা যায়, না মানবার কথা মনে থাকে? তাছাড়া মানেও কি আর কথার বদলায় না যখন সয়তান আধা-আধি বখরা দিতে চায় ভালো মানুষকে? গ্রাউণ্ড সীট সাপ্লায়ার্স্ মিটার এণ্ড মজুমদার কোম্পানীর সঙ্গে পাকাপাকি বোঝাপড়া ক'রে গোয়েন তাকে তাদের আড্ডায় টেনে নিয়ে যায়।

গৌরাঙ্গ বলে, 'না না ভাই ওদিকে আর নয়, আমার ওয়াইফ্ অপেক্ষা করছে।'

গোয়েন হাসে, আরে সে তো করবেই। কিন্তু sacrificeটা আমার মনে রেখো, তুমি বড় অকৃতজ্ঞ।'

'পাগল, তোমার কাছে চিরকাল আমি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।'

'সত্যি?'

কিন্তু শুধু মানুষের কৃতজ্ঞতার ওপর ভরসা করবার মত লোক গোয়েন নয়। নির্দিষ্ট দিনে ডিপোতে সে উপস্থিত থাকে না। কিন্তু গৌরাঙ্গের জন্য তার ফাঁদ তৈরীই থাকে।

তারপর গৌরাঙ্গকে একদিন খুব অস্থিরভাবে বাড়ী ফিরতে দেখা যায়।

রাণু বলে, 'হয়েছে কি, অমন করছ কেন ?'

গৌরাঙ্গ বলে, 'না, অমন করব কেন ? তোমার আর কি, পায়ের ওপর পা তুলে বসে খাবে। আর কিছুদিন কেবল ঘানি ঘুরিয়ে আসতে হবে আমাকে।'

রাণু বিবর্ণ মুখে বলে, 'কি যাতা বলছ, ঘানি ঘুরাতে হবে কেন ?'

শুধু আজই নয় কদিন যাবতই গৌরাঙ্গ এমন অন্যমনস্ক। প্রায়ই চমকে ওঠে, আর ঘুমের ঘোরে বলে 'ঘানি—ঘানি।'

অনেকক্ষণ বসে বসে গৌরাঙ্গও ভাবে। ঘানি তাকে ঘুরাতে হয় না যদি গোয়েনের কথায় সে রাজী হয়ে যায়। মাত্র একদিনের জন্য যদি সেও দেয় আধা-আধি বখরা সত্যি ঘানি তাকে কেন ঘুরাতে হবে ? কি এসে যাবে ? কেইবা জানবে ? আর এই বিপদ থেকে আপাতত যদি রক্ষা পাওয়া যায়, গোয়েনকে সেও পরে দেখে নিতে পারবে। তাইতো, মিছামিছি ঘানি ঘুরাতে যাবে সে কোন্ দুঃখে।

রাণু আবার জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে বল না ?'

গৌরাঙ্গ হাসে, 'কিছু না, আমি তোমাকে এমনি ঠাট্টা করছিলাম।'

'তাই বল, আমার তো বাপু বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছিল।'

'পাগল ! ভালো কথা, সেদিনের সেই গোয়েন সাহেবকে মনে আছে ? সেই যে সুন্দরপানা সাহেব ? একসঙ্গে বসে আমরা সিনেমা দেখলাম সেদিন ?'

'হ্যাঁ, তাই কি ?'

গৌরাঙ্গ একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'সে কাল সন্ধ্যায় আসবে আমাদের এখানে চা খেতে।'

রাণু বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমাদের এখানে ! বল কি ! লোকটা না সয়তান, তুমি সে দিন ব'লেছিলে ?'

গৌরাঙ্গ বলল, 'ঠাট্টা ক'রেছিলাম। আসলে আমার খুব বন্ধুলোক,

আসবে চা টা খাবে, একটু গল্পগুজব করবে, চলে যাবে। চমৎকার আলাপী, দারুণ ফুর্তিবাজ। দোষের মধ্যে একটু ফাজিল। কিন্তু অমন ফাজিল ফক্কর না হতে পারলে আজকালকার দিনে চলে না, বুঝলে ?'

আনাদির কণ্ঠই শুধু নয়, তার মুখের আদল ও যেন দেখা যাচ্ছে গৌরাঙ্গের মুখে। রাণু এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে, তারপর অদ্ভুত বিবর্ণ হেসে বলে, 'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

খবর দিল এসে ওপাড়ার সেখেদের বাড়ির হামিদ। কাদেরের সঙ্গে সেও কলকাতায় গিয়েছিল ছাতা সারার কাজে। কাজকর্ম তেমন সুবিধা না হওয়ায় হামিদ কিছুদিন পরেই ফিরে এসেছে। কিন্তু কাদের আর ফেরেনি, সে যুদ্ধের কাজ নিয়ে চলে গেছে। হামিদ অনেক অনুরোধ উপরোধ করেছিল যাতে এসব কাজে সে না যায়। কিন্তু কাদেরের গোঁ তো সকলেরই জানা আছে। সে কি কারো কথা শোনার পাত্র! কোথায় কি রকমের কাজ কত মাইনে এসব বৃত্তান্ত কিছুই হামিদ জানে না। না বললে সে জানবে কি ক'রে? সে তো আর মানুষের মনের কথা গুণে বার করতে পারে না! কাদের কেবল বলেছে 'ভাইকে গিয়ে বলিস, সে যুদ্ধে চলে গিয়েছে। সে খুব খুসি হবে শুনলে।'

কাদেরের বড় ভাই ইব্রাহিম হুঁকা টানতে টানতে গম্ভীরভাবে সব বিবরণ শুনছিল। শেষের কথাটা শুনে হঠাৎ এবার হেসে বলল, 'তাহ'লে তাই বল্ হামিদ। তোর দোস্ত আমাকে ভয় দেখিয়ে বাহাদুরি নেওয়ার জন্যই কথাগুলি বলেছে। কলকাতাতেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থেকে ব'লে পাঠিয়েছে সে যুদ্ধে গেছে। সেপাই বানাবার আর লোক পায়নি সরকার!'

এই ব্যাখ্যায় সকলের মুখেই একটু তৃপ্তির আভাস দেখা দিল। কাদেরের মা সামনে কাঠের মত দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণ তার মুখ দিয়ে আর বাঙ্-নিষ্পত্তি হয়নি। এবার সেও একটু হাসল, 'বাপরে বাপ, তুই আমার প্রাণ চমকে দিয়েছিলি হামিদ। এমন সর্বনেশে তামাসাও মানুষ করে? আর আমি কি তোর ঠাট্টা তামাসার পাত্র? এবার বল দেখি, কবে আসছে সে। আর খরচ কিছু পাঠিয়েছে তো তোর সঙ্গে?'

কাদেরের বউ লালবানুও বেড়ার আড়ালে উৎকর্ণ হয়ে আছে। শেষের কথাগুলির জবাব জানবার আগ্রহ তারও কম নয়।

হামিদ বুক পকেট থেকে ছোট একটি চামড়ার মণিব্যাগ বার করল, তারপর তার ভিতর থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে কাদেরের মার হাতে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এই নাও খরচ। কিন্তু মোট খাকীর পোষাক পরে পল্টনের দলের সঙ্গে কাদেরকে চলে যেতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বিশ্বাস কর আর না কর সে তোমাদের খুসি, ভালো কথা, তার পরনের জামা কাপড়ও সে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। পুঁটলিটা আনতে ভুলে গেছি।

ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে তারপর কাদের বলল, 'ভাইসাব বিকালের দিকে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে আপনিই না হয় নিয়ে আসবেন জিনিসগুলো। কাদের বলেছে এ সবে আমার আর কাজ নেই হামিদ; ওগুলি মা আর তোর ভাবীসাংকে দিস, কাঁথা-টাথা সেলাই করবে। আমার আর কিছু অভাব নেই, খোরাক-পোষাক, শোয়ার বিছানা পর্যন্ত সরকারের খরচে।'

কাদেরের মা এবার হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল এবং বড়ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোদের জন্যই এমন হল, তোর আর তোর বউয়ের জ্বালা যন্ত্রাণায় টিকতে না পেরেই বাছা আমার মরতে গেছে।'

দুঃখ কারোরই কম হয় নি। কিন্তু এমন অযথা অপবাদও মানুষের শরীরে সয় না। ইব্রাহিম থামে হুঁকোটা ঠেস দিয়ে রেখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, 'তোমার ছেলে কি আমাদের খেত পরত যে আমরা তাকে জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে দেশ ছাড়া করতে যাব। ভারি স্বার্থ আমাদের তাতে। গিয়ে যদি সে থাকেই আর কারো জ্বালায় নয় তোমার ঐ সাধের ছোট বউয়ের দাপটেই বেরিয়েছে। একসন্ধ্যা একমুঠো ভাত কম পড়লে যে ঘরের মাটি খুঁড়ে তোলে তার জন্য গেছে। মিথ্যা পরের ঘাড়ে দোষ চাপালে হবে কি? আসল গোড়া ঘর তো তোমার ঘরের মধ্যেই। সে তুমি দেখতে পাবে কেন? আজকাল ছোট বউ আর তার বাপ

মেছের খাঁই হল তোমার মস্ত কুটুম্ব। ওর ঝাড়সুদ্ধ বদমাস্। ওদের কি আর আমার চিনতে বাকি আছে?'

মার একচোখোমি ইদানীং ইব্রাহিমের সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছিল। কাদেরের মত অমন আহ্লাদে কথাবার্তা মার সঙ্গে সে বলে না বটে, কিন্তু ভাগের ভাগ বছরে ছ'মাস মাকে সেওতো খেতে দেয়। কিন্তু এমন একচোখোমি মার যে তার ঘরেও যখন খায় তখনো ফুরসুৎ পেলে কাজকর্ম ক'রে গিয়ে কাদেরের ঘরে। তার ভাত বেড়ে দেয়, ছেঁড়া লুঙ্গি সেলাই করতে বসে, যত্ন ক'রে চুল বেঁধে দেয় ছোট বউয়ের। এদিকে এতগুলি ছেলে মেয়ে নিয়ে তার বউ মরল কি বাঁচল সে খোঁজে তার দরকার নেই। যেন কাদেরই তার একমাত্র ছেলে, আর সব জলে ভেসে এসেছে!

ঘরের ভিতর থেকে লালবানুও মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, নিজের মার নামে যার যা খুসি বলুক, কিন্তু তার বাপের বিরুদ্ধে কেউ যেন টুঁশব্দ না করে। মেছের সর্দারের নামে এখনো বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এ সব কথা তার কানে উঠলে রক্ষা থাকবে না। ইব্রাহিমও জবাব দিল, অমন হাজার মেছের সর্দারকে সে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে।

সুতরাং সম্বন্ধটা পূর্ববৎ রেষারেষির ভিতর দিয়েই চলতে লাগল। কাদের বাড়ি নেই বলে বাড়ীর একগাছা কুটোও ইব্রাহিম বেশী নেবে তার জো নেই। দুই শাশুড়ী-বউ অনুক্ষণ সবদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে। আর ইব্রাহিমের মনে হয় ছোট বউ লালবানু যেন কাদেরের চেয়েও এক কাঠি বাড়া। ভাই বলে যদি বা এক আধটু মায়া মমতা ছিল কাদেরের মনে লালবানুর তাও নেই। ইব্রাহিম আর তার বউ আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া-ঝাটি করেই তার আনন্দ।

ইতিমধ্যে মেছের সর্দার এসে মেয়েকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

'জামাই যখন চলেই গেছে তখন আর তোর এখানে থেকে কষ্ট

পাওয়া দরকার কি, আর যাই হোক আমার ওখানে ভাত কাপড়ের তো তোর আর অভাব হবে না ?'

কিন্তু লালবানু কিছুতেই যায়নি। গেলে নাকি শাশুড়ীর চোখে ধূলো দিয়ে সব তার ভাসুর লুটে পুটে নেবে। একগাছ কুটোও আর লালবানুদের অবশিষ্ট থাকবে না।

এ সব কথা কানে যাওয়ায় ইব্রাহিম বলে মেছের সর্দারেরই তো ঝাড়! ওর প্রবৃত্তি এমন ছোট হবে না তো হবে কার। আসলে লোকে যে ওদের স্বপক্ষে কথা বলে সে ওর মুখ দেখে। কিন্তু তারা তো জানে না যে, ও একেবারে পাকা ধেনো লঙ্কা। দেখতে বেশ ছোট-খাট আর খাপ্‌সুরৎ কিন্তু ভিতরে একেবারে বিষ!

কিন্তু ধেনো লঙ্কার ঝালও যেন ঝিমিয়ে এল। দু'মাস হ'ল কাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছে এর মধ্যে না এল কোন খরচপত্র, না একখানা চিঠি। কি হ'ল কাদেরের। এদিকে ঘটী বাটি যা ছিল সব কাজী বাড়িতে বাঁধা পড়েছে। আর বাঁধা দেওয়ারও কিছু নেই। গরুর দুধ রোজ দিয়ে যা দু'চার আনা পাওয়া যেত-তাও বন্ধ হবার জো হয়েছে। গরুর মুখে খড়কুটো পড়লে তো দুধ হবে! ইব্রাহিম ইতিমধ্যে একবার প্রস্তাব করে, না খাইয়ে খাইয়ে গরুটাকে তো ওরা মেরে ফেলল। এর চেয়ে ইব্রাহিমকে তারা গরুটা দিয়ে দিলেই পারে। সে এগার টাকা পর্যন্ত দিতে পারে। ঐ হাড় বের করা মরা গরু এর চেয়ে বেশী দামে আর কে কিনবে?

লালবানু বলে, 'না কেনে না কিনুক, বিলিয়ে দেব মানুষকে, তবু ওদের দেব না।'

খাওয়ার কষ্টের চেয়ে আর বড় কিছু নেই। কাদেরের মাও এখন একাজে ওকাজে বড়ছেলে ইব্রাহিমের ঘরে যায়, কাজকর্ম ক'রে দিয়ে দু' একবার খেয়েও আসে। তার ইচ্ছা লালবানু এবার বাপের বাড়ি চলে যাক। আর কেন।

মুখ ফুটে বউকে সেদিন বলেই বসল ইব্রাহিমের মা, 'এখানে থেকে

কেন মিছামিছি শুকিয়ে মরছিস বউ, তার চেয়ে তুই চলে যা সেখানে, সর্দার যখন এত ক'রে বলছে। তোর কষ্ট আমি আর চোখে দেখতে পারি না।'

লালবানু তীক্ষ্ণ হেসে জবাব দিয়েছে, 'বেশ তো মাস কয়েক বড় ছেলের ঘরে গিয়েই এখন থাক না, তাহ'লে আর এসব দেখতে হবে না। লুকিয়ে লুকিয়ে তো যাচ্ছই, এবার বিছানা-পাটি নিয়ে বলে কয়েই যাও। তাছাড়া পালা তো এখন ওদেরই, মেয়েমানুষ হয়ে আমি কি তোমাকে সারা বছর ধ'রে পুষব ?'

শাশুড়ী বিস্ময়ে এবং বেদনায় নির্বাক হয়ে রয়েছে।

মেছের আবার একদিন এসে মেয়েকে বলল, 'আমার এমন সাধ্য নেই যে সংসার থেকে কিছু তুলে এনে আলাদা ক'রে তোকে দিই, কিন্তু তুই যদি ওখানে যাস পাঁচজনের সঙ্গে তোরও চলে যাবে।'

লালবানু বলল, 'তোমার অবস্থা তো আমি জানি বাজান। দেখি আরো দু'চার দিন।'

কিন্তু দু'চার দিনের জায়গায় দু সপ্তাহ গড়িয়ে গেল তবু কাদেরের কোন খবর এলো না। নিশ্চয়ই আর সে বেঁচে নেই।

ইব্রাহিমের বড় মেয়ে ফতেমা এসে বলল, 'চাচী মাটীতে উপুড় হয়ে কাঁদছে বাজান দেখে এলাম।'

ইব্রাহিমের মনও চঞ্চল হয়ে উঠল, কিন্তু মুখে মেয়েকে ধমক দিয়ে বলল, 'যা এখান থেকে। কাঁদলে করব কি।'

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে ইব্রাহিম আর একবার দক্ষিণ পাড়ায় ডাক ঘরের দিকে চলল।

এতদিন পরে লালবানুর নামে খামে চিঠি এসেছে। বাড়ী আসা পর্যন্ত আর সবুর সয়নি ইব্রাহিমের। ডাক ঘর থেকে বেরিয়েই চিঠির মোড়ক ছিঁড়ে ফেলে সাহাদের একটি ছেলেকে দিয়ে সে চিঠি ইব্রাহিম পড়িয়ে শুনেছে। তার মত কাদেরও নিরক্ষর। নিজে সে নিশ্চয়ই লিখতে পারেনি। কোন বাবু ভুঁইয়াকে ধরে-টরে লিখিয়ে থাকবে। সব

বইয়ের ভাষা, আর কেবল ভালোবাসার কথা। আর কিছু না বুঝতে পারলেও এটুকু ইব্রাহিম বেশ বুঝতে পেরেছে। ইব্রাহিমের নামগন্ধও সে চিঠির মধ্যে নেই। শেষে আছে কুড়ি টাকা স্ত্রীর নামে কাদের মণিঅর্ডার ক'রে পাঠিয়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই সে টাকা লালবানু নিশ্চয়ই পাবে। না পেয়ে থাকলে যেন জানায়, সরকার থেকে তার সমুচিত ব্যবস্থা হবে।

ইব্রাহিমের মুখে চিঠির সারাংশ শুনে তার মা কিংবা লালবানু কারো তৃপ্তি হ'ল না। লালবানু তো চটেই লাল। তার নামের চিঠি কেন অন্যে খুলে পড়বে। থানায় যদি সে একথা জানায় তবে ইচ্ছা করলে জেলে দিতে পারে সে ইব্রাহিমকে। মেছের সর্দারের মেয়ে হয়ে মামলা মোকদ্দমার সমস্ত কানুন তার কণ্ঠস্থ।

কাদেরের মা আর না থাকতে পেরে বলল, 'দে দেখি বউ চিঠিখানা, আমি একবার ভুঁইয়াদের গোবিন্দকে দিয়ে পড়িয়ে শুনি!'

লালবানু বলল, 'কথা শোন, আমার সোয়ামীর লেখা চিঠি আমি এখন হাটে বাজারে পাঠাই পড়বার জন্য। একি তোমার কাছে লিখেছে যে দশজনকে দিয়ে তা পড়ান যাবে?' তারপর গলা নামিয়ে লালবানু আস্তে আস্তে বলল, 'তার চেয়ে ছোট ভুঁইয়াকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো না। চিঠিটা এখানে বসে পড়লে আমিও শুনব, তুমিও শুনবে।'

খানকয়েক বাড়ি উত্তরে বোসেদের ছোট ছেলে গোবিন্দ আছে বাড়িতে। চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ দেখাতে হলে লোকে তার কাছেই যায়। গোবিন্দেরও এ সময় বাড়ি থাকবার কথা নয়, কলকাতায় সে কলেজে পড়ে। হঠাৎ একদিন গলা দিয়ে খানিকটা রক্ত পড়ায় তার অন্যান্য ভাইয়েরা ওষুধপত্র দিয়ে ডাক্তারের পরামর্শে তাকে দেশেই পাঠিয়ে দিয়েছে। বাড়িতে থাকেন গোবিন্দের মা, বাবা আর ছোট পিসী। বাবা মাইল তিনেক দূরে এক গঞ্জে জমিদারের সেরেস্তায় কাজ

করেন। সকালে বেরোন, ফেরেন রাত্রে। বইপত্র নিয়ে গোবিন্দ একা একা দিন কাটায়।

কাদেরের মার অনুরোধে তাকে আসতে হল লালবানুর চিঠি পড়ে দিতে। গোবিন্দ অবশ্য আপত্তি করেছিল, 'তোমার বউয়ের কাছে লেখা আমি কি ক'রে পড়ব কাদেরের মা?'

'তাতে দোষ কি বাপজান? না হলে কাকে দিয়ে পড়াব? আপনি আর আপত্তি করবেন না ছোটকর্তা। এই তিন মাস পরে কাদেরের চিঠি এসেছে। বউটা তো একেবারে পাগল হবার জো হয়েছিল।'

বাড়িতে কাদেরের অংশের ভিতর-বার অবশ্য প্রায় একই। একখানা মাত্র ঘর। শনের ছাউনি, চারিদিকে পাকাটির বেড়া। সামনে একটু বারান্দার মত আছে। সেখানে তাকে নিয়ে এসে কাদেরের মা বলল, 'ছোট জলচৌকিখানা আমার হাতে দে তো বউ, কর্তাকে বসতে দি।'

গোবিন্দ বলল, 'না না, জলচৌকির আর দরকার নেই, এমনিতেই হবে।' কিন্তু ততক্ষণে জলচৌকি আর চিঠি দুইই এসে পৌঁচেছে।

চৌকিখানা পেতে দিতে দিতে কাদেরের মা বলল, 'এখানা আমার কাদের নিজে তৈরী ক'রেছে ছোটকর্তা। শয়তানের সব বিদ্যে জানা। বলেছিল, 'মা, এর ওপর বসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বাবুদের মত দিব্যি আরাম ক'রে তামুক টানব।' কাদেরের মায়ের চক্ষে জল এল। তারপর চোখ মুছে সে বলল, 'ভালো কথা, আপনাকে তামুক এনে দেবে ছোটকর্তা? আমার বড় ছেলের ঘরে তামুক আছে, যা দেখি লালবানু বলগে কর্তা এসেছেন।'

গোবিন্দ ক্ষেপে বলল, 'না না, তামাক আমি মোটেই খাইনে কাদেরের মা। ছেলের জন্য অত চিন্তিতই হচ্ছ কেন তুমি? যুদ্ধের চাকরিতে কাদের কি একাই গেছে?'

চিঠিখানা নেড়ে গোবিন্দ আরক্ত মুখে বলল, 'কিন্তু এ চিঠি তো তোমাকে শুনানো শক্ত কাদেরের মা। এ তার বউয়ের কাছে লেখা চিঠি। কাকে দিয়ে যেন লিখিয়েছে। ভারী ফাজলেমি করেছে চিঠির মধ্যে।'

কাদেরের মা একটু তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, 'তাতে দোষ নেই বাপজান। এই তো ফাজলেমির বয়স। তা আমি না হয় একটু সরে দাঁড়াচ্ছি। তুমি চিঠিখানা পড়ে দাও।' বলে কাদেরের মা বারান্দা থেকে নেমে ঘরের কোণায় গিয়ে অলক্ষ্যে দাঁড়ায়। অগত্যা কিছু বাদ-সাদ দিয়ে এবং যেখানে যেখানে ভাষা কিছু নির্লজ্জ এবং অশোভন হয়ে পড়েছে সে সব জায়গায় শোভন রুচিসম্মত কথা বসিয়ে গোবিন্দ লালবানুকে তার স্বামীর চিঠি পড়ে শোনায়।

কাদের লিখেছে এমন না বলে কয়ে হঠাৎ যে কাদের লালবানুদের ছেড়ে চলে এসেছে তার জন্য লালবানু কি তাকে ক্ষমা করবে? আসা অবধি এই চিন্তা ছাড়া তার মনে আর কিছু স্থান পায়নি! কেমন আছে লালবানু, একা একা কি করে কাটছে তার দিন। বিদেশে বিভুঁয়ে এত কষ্ট সে যে সহ্য করছে সে কেবল লালবানুর কথা ভেবেই—তার যাতে খাওয়া পরার কোন কষ্ট না হয় সেই জন্যই। লালবানু যেন তার জন্য খুব চিন্তা না করে। কাদের নিয়মিত টাকা পাঠাবে। এই উপলক্ষে কত দেশ বিদেশ যে তার দেখা হয়ে গেল তার ঠিকানা নেই। কত কথা, কত গল্প যে বলবার আছে লালবানুকে, চিঠিতে তো সব লিখবার জায়গা নেই তাই সেগুলি মুখোমুখি ব'সে পাশাপাশি শুয়ে বলবার জন্য মুলতুবী রইল। রাতের পর রাত কিন্তু ভোর হয়ে যাবে, তখন যেন লালবানু না বলে তার ঘুম পাচ্ছে।

এমন ভাষায়, এমন ভঙ্গিতে কোনদিন তার সঙ্গে প্রেমালাপ করেনি। তবু সুর তো এক, মাধুর্য তো তেমনি। কথাগুলির সব যে লালবানু বুঝতে পারে তা নয়, বরং বেশির ভাগই তার কাছে দুর্বোধ্য লাগল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমনও তার ইচ্ছা হ'তে লাগল যে চাকরি থেকে এসে কাদের যদি এমনভাবে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তো বেশ হয়, সব না বোঝা গেলেও ভারী সুন্দর আর মিষ্টি কিন্তু কথাগুলো!

মাসে নিয়মিত কুড়ি টাকা ক'রে পাঠায় কাদের আর আসে তার খান চারেক ক'রে চিঠি। লিখতে তার ডাক খরচ লাগে না, সে লিখেছে তার কাছে চিঠি লিখতে হলেও কারো পয়সা লাগবে না। শুধু খামের ওপরে 'অন্ এ্যাকটিভ সার্ভিস' লিখে দিলেই হবে। সপ্তাহে একখানা করে চিঠি আসে লালবানুর নামে। আর তা পড়বার জন্য গোবিন্দের ডাক পড়ে। প্রত্যেক চিঠিতেই প্রায় এক কথা থাকে, তবু লালবানুর মনে হয় প্রত্যেকখানাই নতুন। আর কথাগুলির মাধুর্যের শেষ নেই। লালবানুর নিজেরও লোভ হয় অমন করে চিঠি লিখতে, অমন ক'রে কথা বলতে। চিঠির ভাষায় যে কথা বলা যায় তা শুনেছে সে গোবিন্দের মুখে। চিঠিপড়া শেষ হয়ে গেলে যখন লালবানুর শাশুড়ীর সঙ্গে গোবিন্দ অন্যান্য দু'একটা কথা বলে লালবানু লক্ষ্য করেছে তাও ঠিক অমনি মিষ্টি।

ঝগড়া কলহে লালবানুর যেন তেমন আর প্রবৃত্তি হয় না। চিঠির ভাষা আর গোবিন্দের কথাবার্তার তুলনায় নিজের কথাগুলি নিজের কানেই ভারী খারাপ লাগে লালবানুর। আর এই কথাগুলি আরো অশ্রাব্য হয় যখন লালবানু রাগ ক'রে জা আর ভাসুরের সঙ্গে গালমন্দ করতে থাকে। যখন ঝগড়া করে তখন অবশ্য টের পায় না, কিন্তু পরে যখন এই ঝগড়ার কথা মনে পড়ে তখন লালবানুর ভারী লজ্জা করতে থাকে।

একদিন তো গোবিন্দের সামনেই পড়ে গেল। গাছের জামরুলের পরিমাণ তার অংশে কম পড়েছে বলে জা'র সঙ্গে তার তুমুল ঝগড়া বেঁধে গিয়েছিল। এমন সময় কাদেরের নতুন চিঠি হাতে গোবিন্দ এসে উপস্থিত।

গোবিন্দ হেসে বলছিল, 'বাপরে! এযে খুনোখুনি বেঁধে গেছে!

মুখে মুখে আর কেন, বউদের বল কাদেরের মা, এবার সড়কি কাতরা বার করুক ঘর থেকে—তবে তো কাজিয়া জমবে।'

লালবানু জামরুল ফেলে লজ্জায় তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকতে পারলে বাঁচে!

বারান্দায় উঠে জলচৌকিতে বসবার পর কাদেরের মা কিছু জামরুল এনে গোবিন্দের সামনে দিয়ে বলছিল, 'খান ছোটকর্তা। তাজা ফল এইমাত্র গাছ থেকে পাড়া।'

গোবিন্দ হেসে বলেছিল, 'তাতো বুঝলুম, কিন্তু কার ভাগ থেকে নিয়ে এলে বল দেখি; তোমাদের ছোট বিবির ভাগের নয় তো?'

ঘরের ভিতর থেকে লালবানুও হাসি চেপে মৃদুস্বরে বলেছিল, কেন, ছোট বিবির ভাগের হলে কি ছোটকর্তা খাবেন না?'

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলেছিল, 'উহুঁ, জাত যাবে।'

তারপর সেই জলচৌকিতে বসে নিতান্ত ছেলেমানুষের মত এক একটা করে জামরুল খেতে খেতে সেদিন গোবিন্দ যেন এক অপূর্ব আনন্দের স্বাদ পেয়েছিল। তাদেরই বর্গাদার নিরক্ষর অতি দরিদ্র একটি মুসলমান পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে মন যে এমন মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তা কি কোন দিন সে কল্পনায়ও আনতে পেরেছে?

সামনে রান্নাঘরের চালার এক কোণায় মোরগবলি গাছটায় ফুল ধরেছে। ফুলগুলি ঠিক মোরগের ঝুঁটির মত দেখতে। তারই খানিকটা পশ্চিমে পানাভরা ছোট মত একটু ডোবায় কয়েকটা হাঁস গিয়ে নেমেছে। এ যেন নতুন আর এক জগৎ তার চোখের সামনে খুলে গেছে, কাছাকাছি, এত ঘনিষ্ঠভাবে পঁচিশ বছর ধ'রে বাস ক'রে এসেও যার পরিচয় এতদিন তার অজ্ঞাত-ই রয়ে গিয়েছিল।

মাঝখানে দিন দশেকের মধ্যে আর কোন চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। তারপর এগার দিনের দিন কাদের স্বয়ং এসে উপস্থিত, সবাইকে

তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য ছুটির খবরটা আগে জানায় নি। বেড়ার ফাঁক দিয়ে লালবানু দেখল, খাকী পোষাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে কাদেরকে। ঠিক একবারে থানার জমাদার সাহেবের মত। চেহারাও আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। এ যেন এক কাদের। সেই ভিতরকার মানুষ, যে মিষ্টি মিষ্টি চিঠি লেখে আর গোবিন্দের মতই অমন সুন্দর ক'রে কথা বলে—সে ভাষার সঙ্গে লালবানুর ভাষার মিল হয় না, তা লালবানু সবটা বুঝতেও পারে না তবু তা মধুর আর রহস্যময়।

কিন্তু লালবানুর অনুমান যে সবখানি সত্য নয় পনের মিনিট যেতে না যেতেই তা ধরা পড়তে লাগল। খাকীর স্যুট ছেড়ে কাদের ততক্ষণে দামী একখানা নীল রঙের লুঙি পরেছে, গায়ে খুব মিহি একটা গেঞ্জি। ঘরের মধ্যে ঢুকে দীর্ঘ ঘোমটায় লালবানুকে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ সেই ঘোমটা ফাঁক ক'রে ধরে চোখ তেরছা ক'রে কাদের হেসে বলল, 'ইস্, বিবি যে একেবারে হিন্দুদের কলা বউ হয়ে গেছে।'

তারপর এক লাফে উঠানে নেমে এসে ইব্রাহিমকে বলল, 'কি খবর ভাই সাব! এতদিন পরে দেশে এলাম তোমাদের, কিছু তামাক টামাক দিয়ে ভদ্রতাও তো করতে হয়!'

ইব্রাহিম অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'এই আনচি তামাক।'

'হ্যাঁ যাও তামাক টামাক আনো। তারপরে, মুরগীগুলি বুঝি সব বিক্রি করে দিয়েছ? ঘর বলতে একটাও রাখনি।'

ট্যাঁক থেকে এক টাকার দু'খানা নোট বার করে দিয়ে ব'লল, 'যাও বাজার থেকে কিনে আনো গিয়ে, যত দামে পাও নিয়ে আসা চাই-ই। উঃ কতকাল ধরে কুমড়ো দিয়ে মুরগীর ছালোন খাইনি। ভারী ভালো রাঁধে আমাদের লালবিবি। বাজার ক'রে নিয়ে এসো। লালবিবি রাঁধবে, সব খাবে আজ আমাদের ঘরে।

ইব্রাহিম বলল, 'আচ্ছা'।

কিছু টাকা হাতে পেয়ে ফূর্তির আর অন্ত নেই কাদেরের।

সে যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। বাড়ির এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে আর কেবলই কথা বলছে। মনে আনন্দ হ'লে সে এমনিই করে বটে। এই বছর খানেকে তার স্বভাবের তেমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এ লালবানুর সেই চির পরিচিত স্বামী।

কিন্তু কুমড়ো দিয়ে মুরগীর ছালোন রাঁধতে ব'সে লালবানুর মনে সেই আগেকার আনন্দ কোথায়? অকারণে জাকে ধমকায়,শাশুড়ীকে মুখ ঝামটা মারে। কে যেন তাকে এক স্বপ্নময়, রহস্যময় পৃথিবী থেকে আবার সেই পুরাতন পাকাটির বেড়া দেওয়া জীর্ণ ঘরের মধ্যে এনে ঢুকিয়েছে। কিন্তু সেখানে কি তাকে আর মানায়?

মাথায় ময়লা কাপড়ের বড় একটা গাঁট। পিছনের পথ দিয়ে বাড়িতে ঢুকে তবু পা টিপে টিপেই ধনঞ্জয় ধুপী এগুতে লাগল। হঠাৎ সামনে গিয়ে মালতীকে একবারে অবাক ক'রে দেবে, ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠবে মালতী, শেষে দেখতে পেয়ে গাল দিয়ে বলবে, 'বুড়ো বয়সে এত রস?'

ওর মুখের বুড়ো কথাটিও মিষ্টি, বুড়ো বলবার ভঙ্গিটি ভারী অপূর্ব

কিন্তু রান্না ঘরের পিছনে এসে অবাক হয়ে গেল ধনঞ্জয় নিজে। ঘরের ভিতর থেকে খিল খিল হাসির শব্দ আসছে; তবে কি আগেই ধনঞ্জয়কে দেখে ফেলল মালতী? ঘরের ভিতরে মিটমিট করে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলছে। সেই আলোতে অবশ্য বাহিরের ধনঞ্জয়কে চোখে পড়বার মালতীর কথা নয়। কিন্তু বলা তো যায় না। ওর নতুন চোখ। ধনঞ্জয়ের মত চোখের দ্যুতি তো আর ওর ধ'রে যায় নি।

লুকিয়ে লুকিয়ে এমন ঘরের পিছনে এসে দাঁড়াবার একটা সরস কৈফিয়ৎ ধনঞ্জয় মনে মনে ঠিক ক'রে নিচ্ছে। হঠাৎ ঘরের ভিতরে আর একজনের গলার শব্দে সে চমকে উঠল।

'হাসোই আর যাই কর, তোমার ও পিঠে পায়েস আমি যদি ছুঁয়েও দেখি তো তোমার কুকুরের নামে আমার নাম রেখো।'

তবু কালো পাথরের বড় বাটি মাণিকের মুখের সামনে নিয়ে এগিয়ে ধরল মালতী। মাণিক মুখ ফিরিয়ে নিল। মালতী ফিক ক'রে এবার একটু হাসল, 'তাই নাকি? কুকুরের নামে নাম রাখব তোমার? আচ্ছা। কিন্তু কুকুর তো আর আমি পুষি না। ভারী মুস্কিলেই পড়া গেল দেখছি।' মালতী অপূর্ব ভঙ্গিতে ভ্রূ কুঁচকালো। 'নাম রাখবার জন্য

আবার কার কুকুর ধার করতে যাব বলতো? আর পারিনে। ভালোবাসবার জন্য একজনকে ধার করলাম আবার তার নাম রাখবার জন্য আর একজনের কুকুর ধার ক'রতে ছুটব বুঝি?' মালতী আবার হেসে উঠল। আর সে হাসির ভঙ্গিতে ঘরের ভিতরে এবং বাইরের দুটি পুরুষের বুকের রক্ত তোলপাড় করতে লাগল।

মালতী বলল, 'আচ্ছা বেশ, খেয়ে তোমার কোন দরকার নেই। আমিই সব খাচ্ছি। তুমি ওখানে গাল ফুলিয়ে বসে থাকবে আর তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমি একটু একটু ক'রে খাব।' বলে মালতী বাটি থেকে একটু মিষ্টান্ন তুলে মুখে দিল।

মাণিক হেসে বলল, 'আমি আর কেড়ে নিতেই জানিনে?'

'জানো নাকি?'

'দেখ জানি কিনা।' মাণিক আরো এগিয়ে এলো।

ধনঞ্জয় নিজেকে যেন আর স্থির রাখতে পারে না, কিন্তু জোর ক'রে সে পা চেপে রাখল মাটিতে। ধৈর্য ধরে সবটা আগে দেখতে হবে। কতখানি গড়ায়।

বাটি হাতে মালতী তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর মাণিকের চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'অত সোজা নয়।

'আচ্ছা কঠিন কি সোজা একবার দেখাই যাক না।' মাণিক উঠে দাঁড়িয়ে বাটিটা ধরতে হাত বাড়াতেই বাটিসুদ্ধ হাতখানা মালতী যথাসাধ্য উঁচু ক'রে ধরল। মাণিক এত কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে যে মালতীর কোমল বুকের স্পর্শ লাগছে তার গায়ে। মিষ্টান্নের বাটি মালতীর হাতেই রইল। সেদিকে একটুও হাত না বাড়িয়ে মাণিক মালতীকে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার সেই মিষ্টান্ন খাওয়া ঠোঁটে পর পর কয়েকটি চুম্বন ক'রে বসল।

মুহূর্তকাল স্তম্ভিত থেকে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল মালতী।

'দেখ দেখ করে কি, শত হলেও গুরুজন তো আমি তোমার।'

মাণিকের বাহুবন্ধের ভিতর থেকে মালতী নিজেকে আস্তে আস্তে

একটু ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু মাণিক তাকে আরো জোরে বুকে চেপে বলল, 'সেই জন্যই তো প্রসাদ নিচ্ছি।'

'প্রসাদ তোমাকে নেওয়াচ্ছি হারামজাদা।' পিছন থেকে বজ্র গর্জন শোনা গেল ধনঞ্জয়ের। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে কোত্থেকে একটা বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে এনেছে ধনঞ্জয়। সপাসপ্ তারই কয়েক ঘা লাগাল মাণিকের পিঠে, হাতে-পায়ে সর্বাঙ্গে।

'হারামজাদা তলে তলে তোমার এই কীর্তি।'

কঞ্চির ঘা ঠেকাতে ঠেকাতে মাণিক কোনরকমে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে দিল ছুট। কয়েক পা পিছনে পিছনে গেল ধনঞ্জয়। কিন্তু মাণিককে আর দেখা গেল না। 'যা এবার কুত্তার মত পালা। কিন্তু কত কাল থাকবি পালিয়ে। সামনে একদিন না একদিন পড়তেই হবে।'

ধনঞ্জয় এবার লাফ দিয়ে উঠল ঘরে। মালতী বাধা দিতে না দিতে চুলের মুঠি ধরে তাকে মাটি থেকে আধ হাত খানেক উঁচু ক'রে ফেলল, আর এক হাতে সর্বাঙ্গে মারতে লাগল কঞ্চির বাড়ি।

ধনঞ্জয়েরই ভাগ্নে মাণিক। বাপ মা নেই, কিন্তু তাই বলে ধনঞ্জয়ের সাথেও কোন সম্পর্ক নেই তার। ক'বছর যাবৎ আছে গিয়ে কুঞ্জ বৈরাগীর আখড়ায়। মাস কয়েক হ'ল কুঞ্জ আর তার বোষ্টমী দু'জনেই মরেছে, তবু মাণিক একা একা সেই আখড়া আগলে আছে। যত সব বদমাসের সঙ্গে তার আড্ডা। এই উনিশ কুড়ি বছর বয়সেই গাঁজা ভাঙ খেয়ে খেয়ে সে পয়লা নম্বরের নেশাখোর হয়ে উঠেছে। বদমাসিতেও তার জোড়া নেই। এতকাল ধনঞ্জয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না কিন্তু বউ ম'রে যাওয়ার পর আবার যেই ধনঞ্জয় বিয়ে ক'রেছে সেদিন থেকেই এ বাড়ীতে আনাগোনার আর অন্ত নেই মাণিকের। মালতীরও যেন টানটা ওর ওপরই বেশী। এই ছ'মাস

ধরে প্রতিদিন মালতীকে সে বুঝিয়েছে এসব ভালো নয়। হোলোই বা ভাগে তবু তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা ধনঞ্জয় পছন্দ করে না। মাণিককেই কি কম শাসিয়েছে ধনঞ্জয়। একথা পর্যন্ত ব'লেছে যে এ বাড়ীতে এলে তার পা আর আস্তো থাকবে না। ফলে ধনঞ্জয় যখন বাড়ী থাকে তখন আর মাণিক এ মুখো হয় না।

সেইদিন থেকে মনে কোন শান্তি নেই ধনঞ্জয়ের। কিন্তু মালতীর ঠিক আগের মতই স্বচ্ছন্দ ব্যবহার। রাঁধে বাড়ে, ঘর সংসারের কাজ করে, আর বোঝায় বোঝায় ধনঞ্জয়ের আনা ময়লা কাপড়ের রাশ কাচে। মালতী না থাকলে ব্যবসাই অচল হ'ত ধনঞ্জয়ের।

ধনঞ্জয় ব'লে, 'এত কষ্ট ক'রে তোর দরকার কি, এর চেয়ে মাণিকের সাথে গিয়ে কণ্ঠি বদল কর। দিব্যি ভিখ মেগে আর পীরিত ক'রে দিন কাটবে।'

মালতী রুখে দাঁড়ায়, 'ছিঃ ছিঃ সোয়ামী হয়ে এসব কথা তুমি বলছ আমাকে ? শুনলেও পাপ।' মালতী কানে আঙুল দেওয়ার ভঙ্গি করে।

ধনঞ্জয় কঠিনভাবে হাসে, 'শুনলেও পাপ তা বটে, তবু যদি নিজের চোখে আমি সব না দেখতাম।'

মালতী কাছে এসে ধনঞ্জয়ের দাড়ি নেড়ে দেয়, 'হয়েছে হয়েছে, চোখের বড়াই আর নাইবা করলে। বুড়ো মানুষের চোখ তা আবার নিজের আর পরের।'

কাপড় ফেরৎ দিতে যাবে ধনঞ্জয়। কিন্তু স্কাই ব্লু রঙের একখানা শাড়ির আর কিছুতে মিল হয় না। শাড়িখানা আড়তদার শম্ভু পোদ্দারের মেজছেলের বউয়ের। যেমন সৌখীন মেজবাবু তেমনি তার বউ।

ধনঞ্জয় বললে, 'ও শাড়িখানা ফেরৎ দে। না হ'লে ভারী চটে যাবেন মেজবাবু। তুই বরং এই লাল পেড়ে শাড়িখানা পর দু'চারদিন। ধুয়ে পরের যাত্রায় ফেরৎ দেব।'

মালতী যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'কথা শোন, আমি আবার কোন্ শাড়িখানা রাখলাম তোমার।'

তারপর পরনের ময়লা শাড়িখানা দেখিয়ে বলে, 'এখানার কথা বলছ? এখানা তো তুমিই কিনে দিয়েছিলে সেবার।'

ধমক দিয়ে উঠে ধনঞ্জয়, 'আর ন্যাকামি করতে হবে না মাগী। ব'সে ব'সে তোর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবার সময় নেই আমার। আমি বাড়ি থেকে বেরুলে মাণিক আসবে, তার সঙ্গে এসব করিস। ভালো চাস তো শিগগির নিয়ে আয় শাড়িখানা।'

'আনতেই হবে?'

ধনঞ্জয় কঠিন ভঙ্গিতে বলে, 'হ্যাঁ।'

মালতী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে চলে যায় তারপর দু'তিন মিনিট পরে ধনঞ্জয়ের সামনে এসে দাঁড়ায় 'এই নাও।'

ধনঞ্জয় অবাক হয়ে তাকায়, মেজবাবুর বউয়ের সেই দামী শাড়িই মালতী পরে এসেছে। সুগৌর অঙ্গে ভারী মানিয়েছে কিন্তু মালতীকে। কে বলবে যে মালতীও বড়লোকের ঘরের বউ নয়। একমুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নরম হয়ে ধনঞ্জয় বলে, 'কিন্তু কি করলি বল দেখি। আমি গিয়ে কি বলব গিন্নিমাকে।'

মালতী অম্লান বদনে বলে, 'গিন্নিমাকে কিছু বলে কাজ নেই। মেজবাবুকে একধারে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে বলবে আপনার বউয়ের শাড়িখানা সখ ক'রে মালতী পরেছে দু'দিনের জন্য। দেখুন গিয়ে মানিয়েছে কিনা।'

বলে খিল খিল ক'রে মালতী আবার হেসে উঠেছে। আর নীরবে মাথার কাপড়ের গাঁটটা তুলে নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াবার আগে আর একবার পিছন ফিরে মালতীর মুখের দিকে তাকিয়েছে ধনঞ্জয়।

লজ্জা সরমের বালাই কিছুমাত্র যদি মালতীর থাকে। কিন্তু হাসলে এমন চমৎকার দেখায় ওকে।

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে ধনঞ্জয় জিজ্ঞেস করে, 'তাকে যে দেখছিনে? মারের ভয়ে আজ বুঝি আগে ভাগেই সরে পড়েছে।'

মালতী বিস্ময়ের ভঙ্গিতে জবাব দেয়, 'ওমা, কে আবার সরে পড়বে?'

'মাণিক আসেনি আজ?'

'কথা শোন, তারপর থেকে সে কি আর এ মুখো হয়েছে নাকি?' বিছানায় শুয়ে শুয়ে ধনঞ্জয় বলে, 'কিন্তু এমন সুন্দর ফুলের গন্ধ কোত্থেকে আসছে বল্ দেখি।'

মালতী মুখ টিপে হাসে, 'আমার মুখ থেকে।'

ধনঞ্জয় অবাক হয়ে বলে, 'মুখ থেকে?'

মালতী বলে, 'হ্যাঁ, ফুলের মত মুখ থেকে ফুলের গন্ধ বেরুবে না বেরুবে কি আলকাতরার গন্ধ? ফুল তোমার বাড়ীর দু'চার মাইলের মধ্যে আছে নাকি যে ফুলের গন্ধ আসবে?'

মালতী ধনঞ্জয়কে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকের সাদা লোমগুলির মধ্যে মুখ গোঁজে। তবু একটা হাত আস্তে আস্তে কৌশলে ছাড়িয়ে নিয়ে মালতীর সযত্ন রচিত খোঁপার ওপর বুলায় ধনঞ্জয়। খোঁপার চারপাশে ঘুরিয়ে বড় বড় গন্ধরাজ গোঁজা। অন্ধকারেই সেই ফুলগুলির ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ধনঞ্জয় তাদের আকার পরিমাপ করে। এতবড় গন্ধরাজ কেবল এক মাণিকের আঙিনাতেই আছে। হাতের তালু পুড়ে যেতে থাকে ধনঞ্জয়ের তবু হাতখানা সে তুলে নেয় না। মালতীর নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে সর্বাঙ্গ ধনঞ্জয়ের ঘিন ঘিন করতে থাকে তবু নিজেকে সে ছাড়িয়ে নেয় না। একটু পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'এর চেয়ে তুই ওর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেই তো পারিস।' কিন্তু ধনঞ্জয়ের

বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে মালতী যে ঘুমিয়ে পড়েছে আর তার উঠবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

কাজকর্মে আর উৎসাহ নেই ধনঞ্জয়ের, সমস্ত জীবনটা যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে। এর চেয়ে ওরা যদি চলে যেত তাও সহ্য হ'ত ধনঞ্জয়ের। কিন্তু প্রতিদিন যে মালতী আর মাণিক তাকে বঞ্চনা ক'রে চলেছে এ ক্ষোভ তার কিছুতেই যাবে না। ব্যর্থ আক্রোশে মাণিককে সে খুঁজে খুঁজে ফেরে কিন্তু তার নাগাল পায় না। মালতী আছে হাতের কাছেই। প্রতিমুহূর্তে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করবার ইচ্ছা হয় তাকে কিন্তু তার কাছে গেলেই সমস্ত সংকল্প গুলিয়ে যায় ধনঞ্জয়ের। মালতীর ভালোবাসার অভিনয়, ছল করা চুম্বন, আলিঙ্গন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধনঞ্জয়কে গ্রহণ করতে হয়। মারতে গিয়ে অন্তরে অন্তরে নিজেই সে মার খেতে থাকে।

নিজের এই গোপন দুঃখ নিয়ে ধনঞ্জয় যেন একটা আলাদা জগতে ঢুকে পড়েছে। চারপাশে লোকজন চলে ফেরে, হাট বাজার করে, তাদের সুখ দুঃখের কথা বলে কিন্তু এসব ধনঞ্জয় খানিকটা শোনে তারপর অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়তে থাকে। লোকে বলাবলি করে বুড়োর ভীমরতি ধরেছে, এবার পট ক'রে একদিন পটল তুলবে।

এভাবে কতদিন যেত বলা যায় না কিন্তু বাইরের জগতের ধাক্কায় ধনঞ্জয়ের স্বতন্ত্র জগতও চূর্ণ হয়ে গেল। মালতী আর ধনঞ্জয়ের ছোট্ট সংসারেও দুর্ভিক্ষ স্পর্শ ক'রেছে।

মালতী বলল, 'চাল কিন্তু ঘরে একেবারেই নেই।'

ধনঞ্জয় তাকিয়ে দেখল শুধু ঘরে নয়, হাটে বাজারে কোথাও চাল পাওয়া যায় না। ধান চালের দর ক্রমেই বেড়ে চলছিল কিন্তু ধনঞ্জয় বিশেষ ভাবেনি। যা আছে তাতে দু'জন লোকের কোন না কোন রকমে চলেই যাবে। কিন্তু দেশের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে দু'জনেরও আর চলে না। বিঘে দুই চাকরাণ জমি আছে ধনঞ্জয়ের, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তা একেবারেই অজন্মা গেছে। কুড়িয়ে বাঁচিয়ে দু'চার মুঠো শস্য বাড়িতে তুলেছিল, তাতে তিন মাসও যায়নি। ধনঞ্জয় চিন্তিত

হয়ে পড়ল। সারারাত্রি ভেবে কি একটা মতলব মনে মনে ঠিক ক'রে ধনঞ্জয় কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে, ভোরে উঠে ঘরের অবস্থা দেখে চক্ষু তার স্থির হয়ে গেল। মালতী তখনো অঘোরে ঘুমাচ্ছে কিন্তু স্ত্রী আর চারখানা বেড়া ছাড়া ধনঞ্জয়ের ঘর একেবারে শূন্য। পশ্চিম দিকের ভিতে দুতিন হাত মুখে মস্ত এক সিঁদ। বুঝতে বাকি রইল না এই পথেই সব অদৃশ্য হয়েছে।

সোরগোল ক'রে মালতীকে ডেকে তুলল ধনঞ্জয়, বলল, 'খুব তো মজা ক'রে ঘুমাচ্ছিস, রাত্রে কোন নাগরকে ঘর খুলে দিয়েছিলি বল। সবই যদি বিলিয়ে দিতে পারলি তো তার সঙ্গে নিজেও বেরিয়ে গেলি না কেন।'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে চারদিকে চেয়ে মালতীও হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় তক্তপোষের তলা থেকে নিজের ঝাঁপিটা বার করতে গিয়ে দেখে তাও গেছে। এবার হাউ মাউ ক'রে মালতীও কেঁদে উঠল কিন্তু ধনঞ্জয় নির্দয়ভাবে ধমক দিয়ে বলল, 'থাম মাগী, ওসব মায়া কান্নায় আমি ভুলিনে। এ সেই মাণিকের কাজ, তোকে আর তোর নাগরকে একসঙ্গে যদি আমি জেলে না পুরি আমার নাম ধনঞ্জয় ধুপী নয়।'

দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে এ অঞ্চলের অবস্থা একেবারে অচল হয়ে পড়ল। মাসখানেক আগে যে সব বাড়ীতে একবেলা হাঁড়ি চড়েছে কদিন ধরে সে সব বাড়ীতে শাপলা আর কচু সিদ্ধ চলছে। পঞ্চাশ ষাট টাকা দরেও চাল মিলছে না কোথাও। দু'তিনটে পাড়ায় ইতিমধ্যেই কলেরা আরম্ভ হয়েছে। এ পাড়ায় সবচেয়ে আগে ধরল ধনঞ্জয়কে। বার-কয়েক ভেদবমি হওয়ার পর শুয়ে শুয়ে নিজেই নিজের নাড়ী টেপা আরম্ভ করল ধনঞ্জয় আর কতক্ষণ জীবন আছে নাড়ীর গতি দেখে সে নির্ণয় করবে।

তারপর তিন দিন কচুসিদ্ধ চালাবার পর মালতীও আজ মরিয়া হয়ে বেরিয়েছিল, মাথার ওপর চলছে শ্রাবণের অশ্রান্ত বৃষ্টি, সেদিকে কিছু-মাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিক্ষে ক'রেই হোক চুরি ক'রেই হোক আজ একমুঠো ভাত সে সংগ্রহ করবেই।

দুর্বল দেহে অনেকক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকবার পর হঠাৎ রান্নাঘরের দিক থেকে গোলমালের শব্দে জেগে উঠে খানিকক্ষণ কান খাড়া ক'রে রইল ধনঞ্জয়। উল্টো বাতাসে এখান থেকে কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু গলা যে মালতী আর মাণিকের তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'হারামজাদা কুত্তা আবার এসেছিস। আমি না মরতে মরতেই এসে হাজির হয়েছিস সব দখল করবার জন্য।'

কিন্তু মরা হাড়েও যে ধনঞ্জয়ের কি রকম ভেল্কি খেলে মরবার আগে আজ তা সে ভালো ক'রে বুঝিয়ে ছাড়বে মাণিককে। টলতে টলতে নোংরা কাপড় চোপড়েই ধনঞ্জয় উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াবামাত্রই বিছানার ওপর মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি থামে ঠেস দেওয়া বাঁশের লাঠিখানা তুলে তার ওপর খানিকক্ষণ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিল ধনঞ্জয়। এই লাঠির এক ঘায়ে ওদের দুজনকে শেষ ক'রে তবে সে মরবে।

লাঠিতে ভর ক'রে গুটি গুটি পা ফেলে অতি কষ্টে রান্নাঘরের কানাচে এসে দাঁড়াল ধনঞ্জয়। শেষ তো ওদের করবেই তবু ব্যাপারখানা একটু দেখে নেওয়া যাক।

যা ভেবেছে তাই, সেই মাণিকই। সেদিনের মত আজও ওদের মধ্যে মধুর কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। ধনঞ্জয় লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

মালতীর হাতে পাথরের সেই কালো বাটিটা। কেবলই এ হাত থেকে ও হাতে সেটাকে নিয়ে রাখছে। মাণিকের হাত এড়াবার জন্য একবার বাটি সুদ্ধ হাতখানা মাথার ওপর উঁচু ক'রে ধরছে আর একবার

পিছনে সরাচ্ছে মালতী। কখন আঁচলখানা মাটিতে পড়ে গেছে মালতীর। কিন্তু সেদিকে মাণিকের লক্ষ্য নেই। সে কেবল মালতীর হাতের বাটির দিকে লুব্ধ হাত বাড়াচ্ছে। খানিক পরে পরিশ্রান্তভাবে মাণিক বলল, 'এক মুঠো ভাত দিবি তাই তুই প্রাণ ধ'রে দিতে পারিসনে এই তোর ভালোবাসা। আজ চার পাঁচ দিন ধ'রে ভাতের মুখ দেখিনে।'

মালতী বলল, 'ইস্ কি সাধের নাগররে আমার। এক মুঠো কুড়িয়ে আনবার শক্তি নেই, মেয়েমানুষের খিদের গ্রাসে ভাগ বসাতে এসেছেন। বের হ' দূর হ' এখান থেকে।'

মাণিকের দিকে ভালো ক'রে তাকাল ধনঞ্জয়। কংকালসার, কাঠির মত চেহারা চিঁ চিঁ ক'রে কি বলে স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার চেয়ে মালতীর গলার জোর যেন বেশী। হঠাৎ এক ঝটকায় মালতীর হাত থেকে কি ক'রে বাটিটা ছিনিয়ে নিল মাণিক। কিন্তু মালতীও ছাড়বার পাত্রী নয়। 'নিল নিল, সব নিল' ব'লে শুধু সে তারস্বরে আর্তনাদই ক'রে উঠল না। প্রাণপণ শক্তিতে মাণিককে জাপটে ধ'রে তার হাতে চার পাঁচটি দাঁতও বসিয়ে দিল। দুঃসহ যন্ত্রণায় বাটিটা মাণিকের হাত থেকে খসে পড়ল মাটিতে আর সাদা যুঁই ফুলের মত ভাতগুলি সমস্ত মেঝেময় ছিটকে ছড়িয়ে গেল। ধনঞ্জয়ের জিভেও জল এসে পড়ল ভাতগুলি দেখে।

বেশ হয়েছে। ধনঞ্জয়ের আর প্রয়োজন নেই, নিজেদের হাতেই নিজেরা চরম শাস্তি পাচ্ছে ওরা। মেঝেতে ছড়ানো ভাতগুলি যার যার নিজের দিকে টেনে আনবার চেষ্টায় ওদের মধ্যে তুমুল হাতাহাতি শুরু হয়েছে। কিন্তু লাঠিতে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়ায়ে নিঃশব্দে এই মজার দৃশ্য দেখতে দেখতে শুধু জিভে নয় দুটো চোখেও জল এসে পড়ল ধনঞ্জয়ের। তারপর দু' গাল বেয়ে সেই জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মুকুন্দ বহুক্ষণ ধরেই ওদের অনুসরণ করছিল। বলতে গেলে শিয়ালদ'র সেই একেবারে সাউথ ষ্টেশন থেকেই সে ওদের পিছু নিয়েছে। পাঁচ ছয় জন আধবয়সী নিম্নশ্রেণীর মেয়েমানুষ আর তাদের সঙ্গে সতের আঠার বছরের ওই মেয়েটি। ওর গায়ের রং সঙ্গিনীদের মত কালো হ'লেও চোখ নাক এত টানাটানা আর মুখের ডৌলটি এমন সুশ্রী যে, মুকুন্দের মনে হ'ল বহুকাল সে এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেনি। ভাবলে অবাক হ'তে হয় যে, এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এমন একটি সুশ্রী মেয়ে কোথেকে এসে জুটল।

গেট দিয়ে যখন ওরা বেরোয় তখনই ওদের চোখ-মুখের সতর্ক শংকিত ভঙ্গি দেখে মুকুন্দ বুঝতে পেরেছে যে সে যাদের খুঁজছে তারা এই। কিন্তু সেদিন এমনি একটি মেয়েমানুষের হাতে নাকাল হ'তে হয়েছিল বলে কেবল সন্দেহ মাত্রেই আজ আর বেশী দূর অগ্রসর হ'তে ভরসা হয়নি। আজ হাতে হাতে ধরতে হবে।

সার্কুলার রোড পার হয়ে ক্রমশ দলটি তিন চার ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কতক ঢুকল ডিক্সন লেনে, কতক সার্পেন্টাইন লেনে আর সেই অল্পবয়সী মেয়েটি আধাবয়সী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে চলতে লাগল সোজা উত্তর দিকে, মুকুন্দ আর সবাইকে ছেড়ে দিয়ে ওদেরই পিছু নিল। গোয়েন্দা যে পিছনে লেগেছে তা পদ্মামণিও বুঝতে পেরেছে। কিন্তু মুখপোড়া এমন পিছনে পিছনে ঘুরছে কেন? সামনে এসে বলুক না কি চায়, তারপর সিকিটা আধুলিটা নিয়ে নিষ্কৃতি দিক্। তা তো নয়,

হতভাগা কেবল দূর থেকে তাদের দিকে চোখ রাখছে আর শহরময় পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সোহাগী এক সময় পদ্মমণির একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে বলল, 'লোকটা কিছুতেই যে পিছু ছাড়ছে না মাসী, আমার ভারী ভয় করছে।'

পদ্মমণি ধমকের সুরে বলল 'দেখ, অমন আহ্লাদে আহ্লাদে কথা আমার সয় না। ভয়ই যদি করে তো এসেছিস্‌ কেন? আমি তো তখনই বলেছিলাম ভয় বিপদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু তখন তো বাধা মানলি না, এখন বোঝ মজা। পা চালিয়ে আয় আমার সঙ্গে। ওর চোখে ধুলো দিয়ে গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে। কতক্ষণ আর ঘুরবে পিছনে পিছনে। ওর মুরদ বোঝা গেছে।'

সোহাগী পদ্মমণির গায়ের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে বলল, 'তোর কিন্তু ভারী সাহস মাসী।'

পদ্মমণি সস্নেহে হাসল, 'দু'চার দিন ঘোর আমার সঙ্গে, সাহস তোরও হবে।'

পদ্মমণি জেনেছে, সাহস ক্রমশ এই ভাবেই মানুষের হয়। বছর খানেক বছর দেড়েক আগে পদ্মও ওই সোহাগীর মতই ভীতু ছিল। শহরের কথা শুনলে থর থর ক'রে বুক কাঁপত। স্বামী, শাশুড়ী আর ছেলের সঙ্গে সেই আকালের বছর প্রথম যখন আসে এই শহরে, কি ভয়ই না পদ্মমণির ছিল। যতবার গাড়ী ঘোড়া চলত মনে হোত এই বুঝি তাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে। পাশ দিয়ে লোকে তার দিকে যতবার তাকাতে তাকাতে চলে যেত ততবার অস্বস্তি আর লজ্জায় তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত। মুখ তুলে কারো দিকে চেয়ে ভিক্ষা পর্যন্ত চাইতে পারত না। এই নিয়ে স্বামীর আর শাশুড়ীর কত গাল মন্দ সহ্য করতে হয়েছে তাকে। শেষটায় হাত পেতে চাইতে যখন

শিখল তার আগে ছেলেও গেছে, স্বামীও গেছে। শাশুড়ী মরল তার কয়েকদিন পরে।

তারপর পদ্মমণির আরও নানা রকমের ভয় ভাঙল, লজ্জা ভাঙল, ভাবল এ মুখ দেখাবে কি ক'রে। শেষ পর্যন্ত দেখল কিছুতেই কিছু হয় না সব সয়ে যায়। কে কাকে মুখ তুলে খোঁটা দিতে আসবে! প্রত্যেকের মুখেই তো কালি। সবাই জানে সবারই হাঁড়ির খবর।

পদ্মমণি ভেবেছিল সবই যখন গেল, তখন আর সংসারে কোন দরকারও নেই, কোন আশাও নেই, বাসনাও নেই। কোনদিন এক সন্ধ্যা জোটে তো রাঁধবে, না জোটে তো উপোস করবে।

কিন্তু মাস কয়েক পরে একদিন পাড়ার কুমুদিনী বলল, 'বউ, যারা গেছে তারা তো গেছেই। কেঁদে কেটে তো তাদের আর ফিরে পাবিনে কিন্তু টাকা যদি রোজগার করতে চাস্ তো আমি করিয়ে দিতে পারি।'

পদ্মমণি বলল, 'থুঃ থুঃ ঝাঁটা মারি অমন টাকার মুখে।'

কুমুদিনী তার দিকে চেয়ে হাসল, 'আরে দূর, তুই যা ভেবেছিস তা নয়। পাড়া সম্পর্কে তুই আমার ছোট ভাইয়ের বউ তোকে কি অমন কথা বলতে পারি? তা নয়, পয়সা রোজগারের আরো পথ আছে। শহরে গিয়ে গোপনে গোপনে চাল বিক্রি করতে পারবি আমার সঙ্গে?'

পদ্মমণি অবাক হয়ে বলল, 'চাল! চাল কোথায় পাব?'

কুমুদিনী বলল, 'ফিকির ফন্দি তোকে আমি সব বলে দেব। শুরুতে কেবল গোটা কয়েক টাকা দরকার।'

ফিকির ফন্দি শিখে নিতে পদ্মমণির দেরি লাগেনি। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে তাদের মতই গেরস্থ ঘরের বউ ঝিদের কাছ থেকে সস্তায় ভাল চাল কিনে শহরের বউ-ঝিদের কাছে গিয়ে বিক্রি ক'রে আসতে হয়। কোন কোন সময় দ্বিগুণ তিনগুণ লাভ থাকে। যাতায়াতে রেলভাড়া লাগে আনা ছয়েক, সতর্কভাবে মা কালীগঙ্গার নাম নিয়ে গেটটা পার হতে পারলেই হয়। বাস, তারপরে আর ভয়

নেই। কেবল মাঝে মাঝে এই গোয়েন্দাদের উৎপাত সহ্য করতে হয়। কাউকে কাউকে সিকিটা দু'আনিটা ফেলে দিলেই চলে। কারো বা লোভ আরো বেশী। তাদের হাতে ধরা পড়লে একেক দিন তিন দিনের লাভ পর্যন্ত রেখে যেতে হয়।

কিন্তু এই বছর খানেকের মধ্যে সময় কি অদ্ভুতভাবেই না বদলেছে। ভিক্ষা চাইতে গেলে শহরের যে সব বাড়ী থেকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে সে সব বাড়ীতে, কর্তাগিন্নির কাছে পদ্মমণির এখন কত আদর। বাড়ীর মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'এসো বাছা, ব'সো বাছা' বলে কত যত্ন।

কেউ কেউ নালিস ক'রে বলেন. 'কোথেকে এক পোড়া-কপালে কন্‌ট্রোল এসেছে। চালের মধ্যে কেবল পাথরের কুচি। বলো তো বাছা ওই চাল কি মানুষের গলা দিয়ে গলে ? তোমরা আছ, তাই রক্ষা। কিন্তু মা, অমন পাঁচ দশ সেরে আমার সংসারে কি হবে ? মাসে তিন চার মণের দরকার যে।'

কেউ কেউ দরাদরি করে, আবার ভয়ও দেখায়, 'জানো বে-আইনি ভাবে চাল বেচতে এসেছ। যে কোন মুহূর্তে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারি।'

মনে মনে পদ্মমণির রাগও হয়, ভয়ও হয় ; কিন্তু মুখে সে সব কিছু প্রকাশ না ক'রে শান্ত হেসে বলে, 'বাবারা আমার সঙ্গে তামাসা করছেন। দু'আনা কম দিতে চান দেবেন। থানা পুলিসের কথা আসে কিসে। গিন্নিমার সাথে আমার জানা শোনা কি আর দু'চার দিনের ?'

সেই যে পদ্মমণি যায় আর দু'মাসের মধ্যে সে বাড়ীমুখো হয় না। খবরের পরে গিন্নির কাছে থেকে গোপনে আগামী টাকা নিয়ে তবে আবার সে বাড়ীতে চাল যোগান আরম্ভ করে।

বিক্রিবাটার হিসাব ক'রে পদ্মমণির দিন বেশ কাটছিল। সে দিন সোহাগীর স্বামী এসে তাকে রেখে গেল। বলল, 'করাতের কাজে

যাচ্ছি মাসী, বউটা একা একা বাড়িতে পড়ে থাকবে, একজনে এক কথা বললে তোমারও তো বাজবে। তিন কুলে তো তার কেউ নেই। বেশি দিন বিদেশে থাকব না। যত দিন থাকি খরচ পাঠাব মাসে মাসে।

পদ্মমণি বলল, 'কথা শোনো জামাইয়ের। খরচের জন্য কি এসে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তো শোক তাপের মানুষ, চাল নেই চুলো নেই। পাগলের মত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই এই সোমত্ত মেয়ের ভার আমি কি ক'রে নিই বাবা।'

অনন্ত বলল, 'তোমার কাছে থাকলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকব মাসী। কিন্তু সেই থেকে মেয়ে বায়না ধরেছে, শহর দেখতে যাবে। কিছুতে মোটে বুঝ মানে না ; / অলক্ষ্মী মেয়ে !

পদ্মমণি ধমক দিয়ে বলেছিল, 'আমি কি বেড়াতে যাচ্ছি না কি শহরে ? সঙ্ দেখতে যাচ্ছি যে তুই যাবি আমার সঙ্গে ?

সোহাগী বলেছিল, 'যে জন্যই যাও চোখ দুটো তো আর বাড়ীতে রেখে যাচ্ছ না। ফাঁকতালে ফাঁকতালে সবই দেখে নিতে পারছ। ফাঁকি দিচ্ছ কেবল আমাকে।'

পদ্মমণি রাগ ক'রে বলেছিল, 'তা হ'লে চল। তখনই জানে মেয়ে একটা বিপদ বাধাবে।

খানিকক্ষণ এ-গলি ও-গলি ঘোরার পর সোহাগীই আবার পিছন থেকে পদ্মমণির আঁচল ধরে টান দিল।

পদ্মমণি বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি বলছিস্ বল্।'

সোহাগী পদ্মমণির আঁচলের গিঁট খুলে একটা পান বার করে অর্ধেকটা পদ্মমণিকে দিল আর অর্ধেকটা নিজে চিবুতে চিবুতে বলল, 'নে পান খা। তারপর ঐ রোয়াকের ওপর ব'সে একটু জিরিয়ে নে দেখি, উঃ বাবা হাঁটতে হাঁটতে পা একেবারে পাথরের মত ভার হয়ে গেছে। ভূতটা তো অনেকক্ষণ ছেড়েছে, তবু তোর দৌড় থামে না। আমি কেবল তোর কাণ্ড দেখছিলাম মাসী। আর এই সাহসের বড়াই করে মরিস্ তুই।

পদ্মমণি ভালো ক'রে একবার পিছনের দিকে এবং চারপাশে তাকিয়ে দেখল। সেই চশমাওয়ালা লাকটার আর কোথাও কোন চিহ্ন নেই। তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে পদ্ম মৃদু হেসে বলল, 'সাহস আমার ঠিকই আছে। ভয় কেবল তোকে নিয়ে পোড়ারমুখী।'

কিন্তু রোয়াকে উঠে বসে জিরিয়ে নিতে পদ্ম এখন রাজী হ'ল না। আরামের সময় এখন নয়। কাজ সেরে গাড়ীতে উঠে বসে তারপর বিশ্রামের কথা। বউবাজার ষ্ট্রীট পাড়ি দিয়ে পদ্ম সোজা পুরানো বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এ বাজার পদ্মের চেনা। এইখানে তার একাধিক খদ্দের আছে। কিন্তু পদ্ম খুঁজছে সেই খাট টেবিলের দোকানের টাকপড়া বাবুকে। তিনি সে দিন অনেক ক'রে বলে দিয়েছিলেন।

পাশাপাশি তিন চারটে গলি। কিন্তু সবগুলি খাট টেবিলের দোকানই দেখতে এক রকম। এতবার এসেছে পদ্ম, তবু যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

কিন্তু খানিক পরে হঠাৎ পরিচিত একটি মধুর স্বর তার কানে এলো, এই যে গো! ভুলে গেছ নাকি?

চোখ তুলে চেয়ে দেখে সেই টাকপড়া বাবু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছেন। পদ্মর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তে তিনি আবার একটু হাসলেন, 'কি গো, কি খবর। আমি ভাবলুম বুঝি ভুলেই গেলে।'

পদ্ম এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে বলল, 'না বাবু, ভোলার কি আর জো আছে।

'না না ভুললে চলবে কেন। তারপর, হবে তো?'

পদ্ম ঘাড় নাড়ল।

দোকানের মালিক মধুর কণ্ঠে বললেন, 'তা হলে আর দেরি কেন, ভিতরে এসো। ওটি আবার কে পিছনে।'

'ও আমার বোন-ঝি।'

'বোন-ঝি ? তা বেশ বেশ! এখন থেকেই বিদ্যাভ্যাস করাচ্ছ বুঝি ? এসো গো বাছা এসো।'

দোকানের মালিক তাদের একেবারে ভিতরে নিয়ে গেলেন। সোহাগী সমস্ত ভুলে একটা গ্লাসওয়ালা আলমারীর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে লাগল।

হঠাৎ কার রূঢ় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সোহাগী চমকে উঠে দোরের দিকে তাকাল। সেই লোকটি। সেই চশমা, নাকের নিচে সেই সরু এক চিলতে গোঁফ, সেই লোক। আপাদমস্তক সোহাগীর থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। ভূত তাহলে ছাড়েনি, এতক্ষণ কেবল আড়ালে আড়ালে ছিল।

শুধু সোহাগীই নয়, ভিতরে ভিতরে পদ্মমণি আর দোকানের মালিক হেরম্ববাবুরও কাঁপুনি ধরেছে।

তবু হেরম্ববাবু একটু কেসে এবং ঠোঁটের ওপর একটু হাসি টেনে এনে বললেন, 'আসুন স্যার। কোন ফার্ণিচার চাই না কি আপনার ?'

মুকুন্দ বলল, 'কি চাই, সে আপনি ভালোই বুঝতে পারছেন। কিন্তু এতো ভালো কথা নয়, আপনারা ভদ্রলোক হয়ে যদি এসব ব্ল্যাক মার্কেটিংএর প্রশ্রয় দেন —'

হেরম্ববাবু বললেন, 'না না না, কি যে বলেন স্যার।'

মুকুন্দ আঙুল দিয়ে ছোট-বড় চালের পুঁটলিগুলি দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বটে! কি যে বলি! এ সব কি ? জানেন সবাইকে সুদ্ধ আমি পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করতে পারি ?'

হেরম্ববাবু বললেন, 'তা তো পারেনই স্যার, হেঃ হেঃ হেঃ।' তারপর পালিসওয়ালার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মদন, কি দেখছ তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কোন আক্কেল বুদ্ধি যদি থাকে। যাও, বাবুর জন্য সামনের মোড়ের দোকান থেকে মিঠে পান নিয়ে এসো—'

মুকুন্দ মাথা দিয়ে বলল, 'পান আমি খাইনে।'

'ও! পান ইনি খান না, দরকার নেই পানে। ভালো দেখে সিগারেট নিয়ে এসো এক প্যাকেট।'

মুকুন্দ আবার বাধা দিল, 'কেন ব্যস্ত হচ্ছেন, সিগারেটে আমার দরকার নেই।'

'খান না স্যার?'

মুকুন্দ চড়া মেজাজে বলল, 'উঁহু, বলছি যে না। তবু—'

হেরম্ববাবু বললেন, তাহ'লে যাক, তুমি বরং এক কাপ চা-ই নিয়ে এসো মদন, দেখে শুনে আনবে। কাপটা যেন গরম জলে ধুয়ে নেয় আগে।'

মুকুন্দ অপাঙ্গে একবার সোহাগীর দিকে তাকাল। আর একবার আলমারীর গ্লাসে প্রতিফলিত তার প্রতিবিম্বের দিকে। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে ফোঁটা, দুই ঠোঁট পানের রসে লাল টুক-টুক করছে। কি চমৎকার ওর মুখের ডৌলটি, মুকুন্দ যেন পলক ফেলতে ভুলে গেল। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মুকুন্দ আবার ধমকে উঠল 'মাগী কি কম শয়তান! 'সারাটা দিন আমাকে পিছনে পিছনে ঘুরিয়ে মেরেচ, এখন! এখন কোথায় যাবে? কি আশ্চর্য! এই আধ মণ চাল কি ক'রে কাপড়ের তলায় ক'রে লুকিয়ে আনতে পারল তাই ভাবি। আরও আছে না কি বার কর্?'

পদ্মমণি বলল, 'না বাবু আর নেই!'

মুকুন্দ বলল, 'না, নেই। খোঁচা দিলে আরো কোন্ না আধ মণ খানেক বের হবে?'

হেরম্ববাবু বললেন, 'না স্যার, আর বোধ হয় নেই।'

মুকুন্দ বললে, 'আপনি থামুন। সবাইকে চেনা গেছে, চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা।'

তারপর সোহাগীর দিকে তাকিয়ে মুকুন্দ হঠাৎ ধমকে উঠল, 'হু, কোমরের নীচে তোর আছে ক' মণ?'

সোহাগী কি জবাব দিতে গেল কিন্তু মুখ দিয়ে তার কথা বেরুল না। পানের রসে লাল দুই ঠোঁট থর থর ক'রে কেবল কেঁপে উঠল। মুকুন্দ ক্ষুণ্ণ মনে ভাবল, এমন একটি মেয়েকে রাগ ধমক ছাড়া আর কোন ভালো কথা বলা যাচ্ছে না, এমনই ভাগ্য। পদ্মর দিকে তাকিয়ে মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করল 'কে হয় তোর ও ?'

পদ্ম কিছু বলবার আগে সোহাগী বলল, 'আমার মাসী হয় বাবু।' পদ্ম ভ্রূকুটি করল।

মুকুন্দ হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করল, 'ও কিছু আনেনি, সত্য বলছিস ?'

হ্যাঁ বাবু, এই দোকানের বাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন না।'

হেরম্ববাবু বললেন, 'সত্যিই স্যার ওকে কিছু আনতে দেখিনি। এই যে আপনার চা-সিগারেট এসে গেছে।'

মুকুন্দ বলল, 'চা আপনি খান। যে সে দোকানের চা আমি খাইনে।'

হেমম্ববাবু এবার সিগারেটের বাক্সটা এগিয়ে দিলেন, ভিতরে পাঁচ টাকার একখানি নোট। মুকুন্দ একবার দেখল কি দেখল না, নোটখানা পকেটে পুরে একটা সিগারেট ধরিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর হেরম্ববাবুর দিকে তাকিয়ে পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'প্রশ্রয় দেবেন না। আপনারা প্রশ্রয় দিয়ে দিয়েই তো ওদের বাড়িয়ে তুলেছেন।'

তারপর পদ্মমণি আর সোহাগীর দিকে তাকিয়ে মুকুন্দ বলল, 'এসব পোঁটলা-পুঁটলি তুলে নে। থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

পদ্মমণি কাতর দৃষ্টিতে একবার হেরম্ববাবুর দিকে তাকাল, তারপর মুকুন্দকে বলল, 'এ বারের মত ছেড়ে দিন বাবু।'

হেরম্ব প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার ছেড়েই দিন। গরীব মানুষ পেটের দায়ে এ সব ধরেছে আর কি।'

মুকুন্দ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কর্তব্য বড় কঠোর মশাই।'

হেরম্ববাবু বললেন, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে ছেড়ে দিলেও পারতেন। গরীব মানুষ।'

'ছেড়ে তো দেবই। তবে তার আগে সামান্য একটু দরকার আছে থানায়। সেটুকু সেরেই ছেড়ে দেব।'

দোকানের বাইরে এসে পদ্মমণি আর একবার কাতর অনুনয়ে বলল, 'কিছু জরিমানা নিয়ে আমাদের ছেড়ে দিন বাবু।'

মুকুন্দ ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ। অত সহজ মনে করেছিস্ বুঝি? সোজা থানায় যেতে হবে।'

দু'চার জন মজা দেখবার জন্য পিছন পিছন যাচ্ছিল, মুকুন্দের কুটিল ভ্রূকুটি দেখে তারা নিবৃত্ত হয়ে স'রে দাঁড়াল। অন্ধকারে এ গলি ও গলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে মুকুন্দ হঠাৎ এক সময় পদ্মমণিকে বলল, 'আচ্ছা তুই যা।'

'আর ও?'

'ওর দেরি হবে। থানায় গিয়ে জবানবন্দী নিতে হবে ওর।'

'ছেড়ে দিন না বাবু ওর তো কোন দোষ নেই।'

'দোষ আছে কি না আমি বুঝব, তুই যা।'

পদ্মমণি এক মুহূর্ত কি ভাবল তারপর মনে মনে হেসে বলল, 'আচ্ছা।'

সোহাগীর অস্ফুট কাতরোক্তি শোনা গেল, 'আমাকে ফেলে যাসনে মাসী।'

'আঃ, অমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস কেন ছুঁড়ী। তোকে কি যমের মুখে ফেলে যাচ্ছি না কি, ভয় কি, থানা পুলিস তো আর কিছু হচ্ছে না। এ তো ভালোই।'

মনে হ'ল পদ্মমণি বুঝি চলেই গেল। কিন্তু একটু পরে পিছনে আবার তার পায়ের শব্দ শুনে মুকুন্দ রুখে দাঁড়িয়ে বলল,

'আবার তুই আস্‌ছিস পিছনে পিছনে? বল্‌লুম না তোকে চলে যেতে?'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে পদ্মমণি ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বলল, 'বাবুর বাসা কি খুব কাছেই না কি?'

মুকুন্দ অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'বাসা! বাসার কথা তোকে কে বললে?'

আবছা অন্ধকারে পদ্মমণি একটু হাসল, 'ও কথা কেউ কি বাবু আর মুখ ফুটে বলে, ও আমরা এমনিতেই বুঝে নি।' কোন লজ্জা করবেন না বাবু। মেয়ে কি ওতে মরবে না পচে যাবে? চোখের ওপর কত দেখলুম। কেবল একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন। সারা দিন তো গেল। রাত ন'টার গাড়ী আমাদের ধরতেই হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। দস্তুরীটা—।'

বলে পদ্মমণি হঠাৎ মুকুন্দর সামনে হাত বাড়িয়ে দিল।

মুকুন্দ বলল, 'কি?'

পদ্মমণি একটু লজ্জিত হবার ভঙ্গিতে বলল, 'বাবু যেন কি, 'দস্তুরী তো আগামই পেয়ে থাকি আমরা। আমি ওর আপন মাসী কি না—একমাত্র গার্জিয়ান।'

'মাসী!' হঠাৎ যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল মুকুন্দ, 'তুমি ওর আপন মাসী? সত্যি বলছ?'

আওয়াজের তীক্ষ্ণতা বুঝি পদ্মমণির বুকের ভিতরে গিয়ে বিঁধবে। একটু দম নিয়ে পদ্মমণি বলল, 'মিথ্যে কেন বলতে যাব বাবু, আপন মাসীই তো। তাতে কি হয়েছে কেবল ওরই তো মাসী নয়, সম্পর্কে এখন আপনারও তো মাস্‌-শাশুড়ী!'

নিজের রসিকতায় পদ্মমণি নিজেই ফিক্‌ ক'রে একটু হাসল।

পদ্মমণির এই সানন্দ সহায়তায় উৎফুল্ল হওয়া দূরে থাক, কিছুক্ষণ মুকুন্দ যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল। তার নিজের পাপ, নিজের দুর্বলতা যেন এর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে গেছে।

পদ্মমণি আবার বলল, 'বাবু রাত বেশি হয়ে যাবে যে।'

মুকুন্দ পকেট থেকে পাঁচ টাকার সেই নোটটা পদ্মমণির হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুঃসহ ঘৃণায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'যা পালা, পালা শিগগির।' তারপর নিজেই এক ফাঁকে সরু গলির ভিতর দিয়ে দ্রুতপায়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

খানিকটা রাস্তা প্রায় দৌড়ে গিয়ে বিমল চলন্ত ট্রামের হ্যাণ্ডেলটা ধরে এক মুহূর্ত ঝুলে রইল তারপর ঠেলেঠুলে গিয়ে উঠল ফুট বোর্ডের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে নানারকম আপত্তি এবং মন্তব্য শুরু হয়েছে: 'চাকরির জন্য কি প্রাণ খোয়াবেন নাকি মশাই। এতই যদি তাড়া পাঁচ মিনিট আগেই বেরুলে হয় বাড়ী থেকে?'

'কোথায় দাঁড়িয়েছেন দেখুন দেখি? জুতো দিয়ে দুটো পা একেবারে থেঁতলে দিয়েছেন। রক্ত-মাংসের শরীর মশাই, লোহার নয়। আপনার পা দুটোর ওপর যদি অমনি উঠে দাড়াই তা হ'লেই মজাটা টের পান।'

'ঠুলি তো দেখি দিব্যি এই বয়সেই এক জোড়া পরেছেন। তাতেও কুলোচ্ছে না বুঝি? আর এক জোড়া পরুন না ওর ওপর।'

বিমল সবিনয়ে জবাব দিল, 'আজ্ঞে পয়সায় কুলোয় না, ঠুলির দাম কি রকম চড়েছে তা তো জানেন না!'

'ইস্ আবার রসিকতা হচ্ছে, ভেবেছেন ফকরেমি ক'রেই সব উড়িয়ে দেবেন। যত সব বে-আক্কেল বদমাস—'

ফুট বোর্ডের ওপর বিভিন্ন-বয়সী পনের বিশজন সমধর্মী অফিস-যাত্রীর সহিংস এবং সক্রিয় সম্ভাষণের ফলে বিমল প্রায় বিনা চেষ্টায় হঠাৎ এক সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে গিয়ে আনন্দিত হ'ল। এ একরকম মন্দ নয়। শাপে বর। কিন্তু এখানেও স্বস্তি নেই। কেবলই চাপ লাগছে চারদিক থেকে। দুঃসহ গরমে দম আটকে আসছে। মানুষের অতি সান্নিধ্য কি এমন অস্বস্তিকর, তার গায়ের গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে কি এমন পীড়িত ক'রে তোলে!

তবু পরস্পরকে অবলম্বন ক'রেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দু'পা পেতে

দাঁড়াবার মত স্থান নেই একটু, টাল সামলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে যে কিছু একটা ধরবে তারও জো নেই। বিমল ভারসাম্য রাখবার জন্য বারকয়েক সম্মুখবর্তী সহযাত্রীর কাঁধে হাত রাখল। ভদ্রলোক প্রত্যেকবার ভ্রূ কুঁচকে এবং চোখ বিস্ফারিত ক'রে ফিরে তাকালেন কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

বসবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারাও যে খুব শান্তিতে আছে তা নয়, আড়াল থেকে ছারপোকার কামড় আর প্রকাশ্যে দণ্ডায়মান সহযাত্রীদের ঈর্ষা-কুটিল দৃষ্টি সর্বাঙ্গ বিদ্ধ করছে।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সামনের মহিলা-আসনটির উপর বিমলের চোখ পড়ল। বেঞ্চটির অর্ধাংশে জনতিনেক কেরাণী অত্যন্ত সংকুচিতভাবে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বসেছে আর বাকি অর্ধেকে স্থূলাঙ্গিনী মাঝবয়সী একটি পানওয়ালী রাণীর মত উপবেশন করেছে। মাঝখানে একটি নাতিবৃহৎ পুঁটলি আব্রু এবং আভিজাত্য রক্ষা করছে। বিমল একবার সেই পুঁটলিটার দিকে তাকাল, তারপর হাত বাড়িয়ে সেটাকে তুলে নিয়ে ঠেলে দিল বেঞ্চের তলায় এবং পরক্ষণে শূন্যস্থানে ধপ ক'রে বসে পড়ল।

মানদা সবিস্ময়ে এক মুহূর্ত বিমলের দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর তারস্বরে বলল, 'দেখ, দেখ একবার কীর্তিখানা। একেবারে কোলের ওপর এসে বসল। বলি, চোখের মাথা কি খেয়েছ! পুরুষ লোক মেয়েলোক চিনতে পারো না?'

কৌতুকে বিদ্রূপে শাণিত বিমলের দুটি চোখ মানদার মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। বছর চল্লিশেক বয়স হবে মানদার। মেদে মাংসে বিশাল দেহে কোথাও লাবণ্যের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। মুখে দীর্ঘকালের বিচিত্র অভিজ্ঞতা রেখায়িত হয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রসাধনের অভ্যাসটি যায়নি, পুরুষের মন ভোলাবার ব্যর্থ, হাস্যকর চেষ্টাটি এখনো আছে। অল্পবয়সী মেয়েদের মতই কপালে বড় একটি কালো রঙের টিপ, ঠোঁট দুটি পানের রসে টুক টুক করছে। নিজের এবং পণ্যের

যৌথ বিজ্ঞাপন। বিমল তীক্ষ একটু হাসল, 'চিনতে পারা কঠিন।'

ক্রোধে এবং অপমানে মুহূর্তের জন্য মানদার মুখখানা কালো হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই চোখে মুখে অত্যন্ত অশ্লীল একটা ভঙ্গি এনে বলল, 'মরণ! কথা শোন মিনসের!'

ততক্ষণে সহযাত্রীদের ভিতর থেকে জনকয়েক হো হো করে হেসে উঠেছে।

ব্যাপারটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতক্ষণ যারা রাজনীতি, অফিসনীতি এবং বস্ত্রসমস্যার আলোচনায় মত্ত ছিল তাদের প্রত্যেকেই সকৌতুকে বিমল আর মানদার দিকে তাকাল।

প্রৌঢ় বয়স্ক একজন রসিক ভদ্রলোক বললেন, 'ঘাবড়াবেন না মশাই, চালিয়ে যান। ওদের গালিগালাজে আয়ু বাড়ে। বরং ওদের আদর সোহাগটাই মারাত্মক, তাতেই আয়ুক্ষয়।'

পাশ থেকে আর একজন জবাব দিলেন, 'কেবল আয়ু? বিনোদ বুঝি এতদিনে পয়সার শোকটা সাম্‌লে নিয়েছে?'

বিনোদবাবু কটমট ক'রে তার দিকে তাকালেন, 'ছি কি ইতরামো হচ্ছে গণেশ?'

ইতিমধ্যে সমালোচকের দল দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বেশির ভাগই বিমলের প্রতিকূলে। যে ধরণের স্ত্রীলোকই হোক না, সকলেরই মান মর্যাদা আছে। ভদ্রলোকের কাছ থেকে শিষ্টাচারের দাবী ওরাও করতে পারে। মানদার অনুমতি না নিয়ে কেন বিমল তার পাশে বসতে গেল? অন্যায় বিমলেরই হয়েছে। মানদার কোন দোষ নেই।

মানদা স্ফুর্তি পেয়ে বলল, 'আপনারাই বলুন। এ তো মেয়েদের বসবার জায়গা, কেবল মেয়েরাই বসবে। কিন্তু তিন তিন জন পুরুষ লোককে আমি তো বসতে দিয়েছি। কোন আপত্তি তো করিনি।

ইচ্ছা করলে সবাইকেই তো তুলে দিয়ে আমি দাঁড় করিয়ে রাখতে পারতাম।'

যে তিনজন ভদ্রলোক মানদার বেঞ্চে বসে তার পক্ষ সমর্থন করছিলেন, তারা একটু নড়ে চড়ে বসলেন। একজন বললেন, 'তাই নাকি? তোমার তো তা হ'লে অগাধ ক্ষমতা!'

মানদা বলল, 'কোম্পানীর আইনই তো বাবু তাই, মেয়েদের সীটে পুরুষরা বসতে পারবে না!'

পিছন থেকে আর একজন কে জবাব দিল, 'এত আইনের জ্ঞান নিয়ে পান বিক্রি করছ কেন বাছা, হাইকোর্টে যাও।'

আর একজন মুচকি হেসে বলল, 'রক্ষা ও আইনটা কেবল দিনের জন্য। রাত্রে ওটা তুলে না নিলে তোমাদের কি উপায় হোতো ভাবি।'

পাশের বেঞ্চ থেকে ছোকরা মত একজন এর জবাব দিল, 'কেবল ওদের কেন, উপায় আপনাদেরও থাকত না।'

মানদা বলে যেতে লাগল, 'তা সত্বেও আমি সবাইকেই বসতে দি। ভাবি অফিসের সময় কত কষ্ট ক'রে যাচ্ছে মানুষে। আরও দু'তিনজন লোক যদি একটু বসে যেতে পারে, আমি কেন বাধা দিতে যাই। কিন্তু তাই বলে বলা নেই, কওয়া নেই পুঁটলিটা ফেলে দিয়ে লোকটি আমার গায়ের ওপর এসে বসবে? এ কি ব্যাভার?'

পূর্বোক্ত যুবক কেরাণীটি বলল, 'ঠিক বলছে। অমন ক'রে বসা আপনার উচিত হয় নি, ওটা যখন লেডীজ সীট।'

বিমল বলল, 'কিন্তু লেডী কেউ নেই এখানে।'

লেডী কথাটির অর্থ, মানদা আন্দাজে কি ক'রে বুঝে নিয়ে বলল, 'না নেই। ভদ্রলোক যেন কেবল ওরাই। ফর্সা একটা জামা পরলেই যদি ভদ্রলোক হোত। কন্‌ডাকটারকে বললে এখনই ঘাড় ধরে তুলে দেবে।'

যুক্তিতর্কে অবশ্য বিমল হারে। কিন্তু হার স্বীকার করলে সম্মানের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। যুক্তির জোরে হারলে গলার

জোর যারা প্রয়োগ করতে না জানল ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

বিমল মানদার দিকে চেয়ে চোখ গরম ক'রে বলল, 'খবরদার! মুখ সামলে কথা বলো।'

মানদা বলল, 'ঈস্! তেজ দেখ মিনসের। মারবে নাকি? গায়ে হাত দিয়ে দেখনা একবার!'

পিছনের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'তাহলে তো তুমি একেবারে জল হয়ে যাবে গো। মেয়েমানুষের গায়ে হাত কি লোকে আর মারবার জন্য দেয়।'

পার্শ্ববর্তী গণেশ বললেন, 'বিনোদ, ইঙ্গিতটা পরের মেয়েমানুষ সম্বন্ধে যতখানি খাঁটি, ঘরের মেয়েমানুষ সম্বন্ধে বোধ হয় তত নয়, বিশেষত দু' এক পেগ টেনে যদি ফেরা যায়।'

বিনোদ আর একবার কটমট ক'রে তাকালেন।

দণ্ডায়মান আর একটি প্রৌঢ় এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। তিনি অসহিষ্ণুভাবে এবার বিমলকে ধমকের সুরে বললেন, 'আপনিও তো মশাই কম বে-আক্কেল নাছোড়বান্দা নয়! এত লোক উঠল নামল আপনি ও জায়গাটা ছেড়ে কোথাও একটু নড়তে পারলেন না?'

মানদা বলল, 'তা নড়বে কেন? এখানে হ'ল মধু।'

অনেকেই হো হো ক'রে হেসে উঠল। বিমল অপমানটা হজম ক'রে নিয়ে ঠিক তেমনি অশ্লীল ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'মাইরি! মধুর এখনো বাকি আছে নাকি কিছু? তাহ'লে আর এই ভিড়ের মধ্যে প্যানের পুঁটলি বয়ে বেড়াচ্ছ কেন?'

বিনোদবাবু বলে উঠলেন, 'সাবাস, সাবাস!'

মানদার মুখখানা আর একবার কালো হয়ে গেল। আঘাতটা যেন এবার বড় বেশি লেগেছে। এই বয়সে কালোশশী, কনকতারাও বেশ ক'রে খাচ্ছে। একজন হয়েছে বাড়ীওয়ালী, আর একজনের এখনো নতুন নতুন নাগর জুটছে। কেবল মানদাকেই পানের পুঁটলি হাতে

রোজ কেরাণীদের মত দশটা পাঁচটা এই ভিড় ঠেলে যেতে হচ্ছে অফিস কোয়ার্টারে। দু'চার পয়সার ক্রেতার আশায় বসে থাকতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রথম ভেবেছিল আগে যা ক'রেছে তার চেয়ে কাজটা ভালোই, তার চেয়ে তো সম্মানের। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে তাতে সন্দেহ হয় মানদার, যখন রাস্তায় খোট্টা পুলিস পাহারাওয়ালা বিনা পয়সায় এসে ইয়ার্কি দিতে থাকে, দুপয়সার পানের সঙ্গে সঙ্গে খয়েরী রঙের আঙুলের মাথাগুলি সুদ্ধ যখন চেপে ধরে।

কিন্তু কেবল ব্যবসা আর আর্থিক দীনতাকেই নয়—বিমলের তীক্ষ্ণ শ্লেষ মানদার আরও একটি বড় গোপন এবং নরম জায়গায় আঘাত করেছে। সে তার নারীত্বকে, বিগত অস্তমিত যৌবনকে। বিমলের চোখের ভঙ্গি, কথার ভঙ্গি যেন সমস্ত পুরুষের প্রতিনিধিত্ব বহন করছে। আর কোন আশা নেই জীবনে, কোন আনন্দ নেই। তার দিকে তাকিয়ে পুরুষের দু'চোখে আর মুগ্ধতা নামে না—কটু ব্যঙ্গ, কুশ্রী শ্লেষ ফুটে ওঠে। কারো কাছে কোন দাম নেই মানদার, কোন কদর নেই। তাকে দেখে লোকের কেবল হাসি আসে, ভালোবাসা আসে না। সেই জন্যই বিমল তাকে আজ এমন নির্বিচারে অপমান করতে পারল, তুচ্ছ করতে পারল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বিমলের চোখ একবারও পলক ফেলতে ভুলে গেল না, কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট মুহূর্তের জন্যও কেঁপে উঠল না থর থর ক'রে। বিমলকে প্রৌঢ় আর একবার ধমক দিলেন 'ছি ছি ছি, একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে কি আরম্ভ ক'রেছেন? লজ্জা করে না আপনার?'

লজ্জা! মানদাকে নির্বাক ক'রে দিয়ে বিমল তখন বিজয় গৌরব অনুভব করছে। শত্রুর একমাত্র পরিচয় সে শত্রু। তার জাতি নেই, গোত্র নেই। ক্ষুদে পিঁপড়ে যখন কামড়ায় তখন কি তার ক্ষুদ্রত্বকে অনুকম্পা ক'রে শান্ত থাকতে পারি, বুড়ো আঙুলের ডগায় তাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে পিষে না মারা পর্যন্ত কি শান্তি আসে প্রাণে?

ছোকরা কনডাকটর এতক্ষণে অন্যান্য লোকের কাছে টিকিট

কাটছিল আর মুচকি মুচকি হাসছিল, এবার বিমল আর মানদার কাছে এসে টিকিট চাইল।

বিমল নিজের টিকিটটা কেটে নিল। কনডাকটর মানদার কাছে হাত পাততেই হঠাৎ সে একটু অদ্ভুত হেসে বলল, 'আঃ মরণ! আমি দেব কেন গো। টিকিটের দাম বাবুর কাছ থেকে চেয়ে নাও।' ব'লে আঙুল দিয়ে বিমলকে দেখিয়ে দিল।

সকলে অট্টহাসি ক'রে উঠল। বিনোদবাবু পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাবাস সাবাস।'

এবার বিমলের নির্বাক হবার পালা।

কাস্টম্‌স্ হাউসের সামনের স্টপেজটায় ট্রাম এসে থামতেই জন পঁচিশেক একসঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে শশব্যস্তে দোরের দিকে এগিয়ে এল। বিমল আর পান সুপারির পুঁটলি হাতে মানদাও এগিয়ে এল সেই ভিড়ের মধ্যে। তাদেরও এখানেই নামতে হবে।

ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, কে আগে নামবে, কে পরে। জন কয়েকের ধাক্কায় ট্রাম থেকে রাস্তায় পা ফেলতে না ফেলতেই বিমল টলে গিয়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দেখে মানদা তখনও উঠতে পারেনি। ট্রাম ততক্ষণে সবেগে চলতে শুরু ক'রেছে। বিমল সেইদিকে তাকিয়ে ট্রামের ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে গর্জে উঠল, 'শালা শূয়ারকা বাচ্চা, জেনানা দেখতা নেহি!'

মানদা উঠে দাঁড়িয়ে বিমলকেই সব চেয়ে কাছে দেখে তাকে সাক্ষী মেনে বলল, 'দেখলেন, কাণ্ডটা। লোক নামল কি নামল না দেখা নেই, গাড়ী চালিয়ে দিলেই হ'ল। যত সব মাতাল বদমাস এসে জুটেছে—'

সিগারেটের কৌটা এবং সুপারীগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছিল। মানদার সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে বিমলও তার কিছু কিছু কুড়িয়ে দিল।

মানদা সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, 'আহা হা, আপনি আবার কষ্ট করছেন কেন বাবু।'

বিমল বলল, 'তাতে কি, তোমার লাগে নি তো খুব।'

মানদা তার দিকে একবার চেয়ে সলজ্জে চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'না, কিন্তু আপনার হাতটা তো ভারি ছ'ড়ে গেছে।'

সিগারেটের কৌটাটা একটু দূরে গড়িয়ে পড়েছিল। বিমল সেটাকে তুলে নিয়ে মানদার পুঁটলির ভিতর রেখে দিতে দিতে বলল, 'ও কিছু না, একটা মলম টলম লাগিয়ে দিলেই হবে'খন।

কথার ভঙ্গিতে মানদার মনে হ'ল যেন মলমটা বাহুল্য, বিমলের ক্ষতের জ্বালা অমনিতেই মিটতে শুরু ক'রেছে।

আবরণ

পাটের ক্ষেত নিড়িয়ে দুপুর রোদে বাড়ি ফিরে এসে বংশী দেখল ঘরের ঝাঁপ ভিতর থেকে বন্ধ। বিরক্ত হয়ে ঈষৎ কর্কশ স্বরে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বংশী ধমক দিয়ে উঠল, 'দিন দুপুরে দোর এঁটে ঘরের মধ্যে করছিস কি শুনি? দোর খুলে দে।'

কিন্তু ভিতর থেকে কোন জবাব এলো না।

বংশীর গলা আরও চড়ে গেল: 'গেরাহ্যিই হচ্ছে না, বলি খুলবি দোর না বন্ধ ক'রেই থাকবি?'

এবার চাঁপা স্বামীর চেয়েও উচ্চতর গ্রামে চেঁচিয়ে উঠল, 'না বন্ধ ক'রে থাকব কেন! নেংটা হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লোককে দেখাব সোয়ামীর আমার কেরামতি কতখানি। ভাত কাপড়ের কেউ নয় কেবল পীরিতের গোঁসাই।'

বংশী জ্বলে উঠে বলল, 'দিন নেই রাত নেই, চব্বিশ ঘণ্টা কেবল ভাত কাপড়ের খোঁটা। ভাত কাপড় আমি দিই না তো তোর কোন বাপে এসে দেয়রে হারামজাদী। খুলে দে দরজা। নইলে লাথি মেরে ভেঙে ঘরে ঢুকব বলে দিচ্ছি।' ব'লে বংশী সত্যিই একটা ধাক্কা দিল ঝাঁপে।

চাঁপা এবার শংকিত কাতর কণ্ঠে বলল, 'এক্ষুনি এসো না কিন্তু, পায়ে পড়ি তোমার—আমি বড় বেসামাল হয়ে আছি।'

'ও', বংশী একটু মুচকি হাসল। তারপর চাঁপা সত্যিই কতখানি বেসামাল হয়েছে দেখবার জন্য আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখল। এই গরমের মধ্যে সেই ছেঁড়া ময়লা কাঁথাটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে চাঁপা কতকগুলি টুকরো টুকরো ছেঁড়া নেকড়া জোড়া দিচ্ছে।

বংশী জিজ্ঞাসা করল, 'শাড়ীখানা একেবারেই গেছে নাকি?'

চাঁপা চমকে উঠে পিছনে তাকিয়েই বেড়ায় ফাঁকে বংশীর দুটো কৌতূহলী চোখ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি দুই হাতে সেই ফাঁক চেপে ধ'রে বলল, 'ছি ছি ছি, আবার এখানে এসে দাঁড়িয়েছ। সরো সরো শিগগির, আমি কি গলায় দড়ি দিয়ে মরব তোমার জন্যে?'

বংশী সরে এসে বলল, 'আমি তো আর পর পুরুষ নই—সোয়ামী। আমার কাছে অত লজ্জা কিসের তোর?'

চাঁপা ঝংকার দিয়ে উঠল,'আহাহা, কি সাধের সোয়ামী আমার। এই এক বছরের মধ্যে একখানা কাপড় দিতে পারল না জুটিয়ে তার আবার সোয়ামী, বলতে লজ্জা করে না?'

কাপড় চাঁপার নেই অনেকদিন ধরেই। কিন্তু বংশী কি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে? সে কি কম চেষ্টা করেছে হাটে গঞ্জে একখানা কাপড়ের জন্যে? কিন্তু কোথাও নেই কাপড়। সব দোকানদারের মুখেই এক কথা। নেই, নেই। ওবার যেমন চাল ছিল না, এবার তেমনি একগাছি সুতোও কোথাও জুটছে না। বংশীর নিজের জন্য ভাবনা নেই। কাপড়ে তার দরকার করে না। সেই সস্তার বাজারেই বছরে একখানার বেশি তার কাপড় লাগে নি। এখন তো চব্বিশ ঘণ্টা গামছা পরেই কাটে। কেবল হাটে বাজারে বের হবার সময় ন্যাকড়া-ট্যাকড়া যা হোক কিছু একটু জড়িয়ে নিলেই হয়। কিন্তু অমন সোমত্ত বউয়ের দেহ কি গামছায় ঢাকে? আর সেই গামছাই কি ছাই আছে দেশে! এক হাতি সওয়া হাতি গামছার দাম পাঁচ সিকে দেড় টাকা। বংশী স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'কিন্তু এমন নেংটা হয়ে পড়লি কি ক'রে? সকালেও তো কি একটা প'রে ছিলি।'

চাঁপা বলল, 'হুঁ—বেনারসী প'রে ছিলাম। শাড়ী গয়নায় গা তো আমার ভ'রে রেখেছ কি-না। জল ভ'রে কলসীটা কেবল কাঁখে তুলতে গেছি, কাপড়খানা একেবারে রঞ্জে রঞ্জে খসে গেল। বাড়ি আর আসতে পারি না এমনি দশা। গয়লাদের বিনোদ ছিল ঘাটে। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গলায় দড়ি দি।'

বংশী ধমক দিয়ে বলল, 'অমন দড়ি দড়ি করিস নে। মুখের এক লজ্জ হয়ে গেছে কেবল দড়ি আর দড়ি। শেষ পর্যন্ত দড়িতেই টানবে।'

বংশীর মনে পড়ল, ঝুমুর কান্দির গোকুল মণ্ডলের মেয়ে সত্যিই নাকি গলায় দড়ি দিয়েছে, কালকের হাটে সব বলাবলি করছিল।

নদী থেকে একটা ডুব দিয়ে এসে বংশী বলল, 'ভাতটাত দিবি— না ঘরে খিল দিয়েই থাকবি সারা দিন?'

চাঁপা সানুনয়ে বলল, 'সব আছে রান্না ঘরে। নিজেই এবেলা নিয়ে থুয়ে খাও।'

'কেন, তুই আসতে পারবি নে?'

'অবুঝের মত কথা বলছ কেন? দেখছ না দশা। কি ক'রে বেরোই?'

বংশী রাগ ক'রে উঠল, 'ঢং দেখ মাগীর। একেবারে লজ্জাবতী লতা। কাঁথা জড়িয়েই আয় না, না হয় আমি চোখ বুজে থাকব, চাইব না তোর দিকে। রঙ্গ করিসনে এখন। খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে পেট। নিজে তো এক গাদা পান্তা সেঁদিয়ে বসে আছিস্।'

চাঁপাও সক্রোধে বলল, 'আছি তো আছি। পারব না আমি বেরুতে। কেন, এক বেলা বেড়ে খেতে পারো না? হাতে কি কুট হয়েছে?'

বংশী বলল, 'তেজ দেখ মাগীর। আচ্ছা আসি খেয়ে। দেখব'খন তেজ তোর ভাঙা যায় কি-না।'

ঘরে গিয়ে দেখে ভাত বাড়াই আছে। সব গুছিয়ে টুছিয়ে ঠিক ক'রে রেখে গেছে চাঁপা। কলমী শাক চচ্চড়ি আর তার পাশে খানিকটা কাসুন্দি আর একটি কাঁচা-লঙ্কা সযত্নে রেখে দিয়েছে। দেখে মনটা যেন প্রসন্ন হ'ল বংশীর, তবু বউটা খাওয়ার সময় কাছে বসে না থাকলে কেমন যেন খালি খালি লাগে।

খেয়ে এসে তামাক সেজে বহুক্ষণ ধ'রে দাওয়ায় বসে বসে নিবিষ্ট

মনে বংশী হুঁকা টানল, তারপর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'কি, সারা দিন রাত কি আজ বাইরেই ফেলে রাখবি না কি।'

কিন্তু চাঁপার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ভারী রাগ বউটার, মনে মনে ভারী অভিমান। হুঁকো টানতে টানতে তারপর হঠাৎ এক দুষ্টু বুদ্ধি খেলল বংশীর মাথায়। দাওয়ার বেড়ায় গোঁজা কাঁচিখানা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে ঝাঁপের এক পাশের দড়ি দিল কেটে। তারপর ঝাঁপটা সামান্য একটু টেনে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। কিন্তু স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তেই পা আর এগুলো না বংশীর। একেবারে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ—মাদুরের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে চাঁপা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। মোটা আর ময়লা কাঁথাটা লুটোচ্ছে পায়ের কাছে। গরমে বেশীক্ষণ বোধ হয় আর গায়ে রাখতে পারেনি। ঘুমের ঘোরে লাথি মেরে ঠেলে ফেলেছে। পাশে ছেঁড়া টুকরো টুকরো নেকড়াগুলো ইতস্তত ছড়ানো। সেলাই ক'রে সুবিধা হচ্ছে না দেখে গায়ের রাগে চাঁপা নিজেই বোধ হয় সেগুলি আবার টেনে ছিঁড়েছে। পলকের জন্য সেই নিরাবরণ নারী দেহের দিকে তাকিয়ে বংশী চোখ ফিরিয়ে নিল।

এর জন্য কি কম লোভ ছিল বংশীর। একেক রাত্রে কি কম খোসামোদ করেছে বউকে? আজ আর কোনো বাধা নেই। কিন্তু আজ দুটো চোখ ভালো ক'রে বংশী মেলতে পারল না। ছি ছি ছি।

তাড়াতাড়ি সেই মোটা কাঁথাটা স্ত্রীর দেহের ওপর বংশী তুলে দিতে গেল।

একটু নাড়াতেই চমকে জেগে উঠল চাঁপা, তারপর স্বামীর দিকে এক দুর্বোধ্য অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আবার ঢাকতে যাচ্ছ কেন, নাও ওটাও খুলে নাও।'

বংশী তার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'টাকা নিতে এসেছিলুম। শহর থেকে নিয়ে আসছি কাপড়।'

বাঁশের চোঙার ভিতর থেকে খান চার পাঁচ এক টাকার নোট বের ক'রে নিয়ে বংশী দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু কি

দেখল বংশী? বাড়ি ছাড়িয়ে অনেক দূরে সে এসে পড়েছে। কিন্তু চাঁপার সেই দেহ কিছুতেই যেন চোখের সামনে থেকে সরে যেতে চাইছে না। ছি ছি ছি।

যে ভাবেই পারুক চুরি ক'রে হোক, ডাকাতি ক'রে হোক, কাপড় একখানা আজ এনে দিতেই হবে বউকে, নইলে গোকুল মণ্ডলের মেয়ের মত চাঁপাও হয়তো কখন গলায় দড়ি দিয়ে বসবে। যে লজ্জা চাঁপার আর দিনে দুপুরে যে কাণ্ড আজ ক'রে বসল বংশী।

কাঠ ফাটা রোদে মাইল আড়াই রাস্তা পাড়ি দিয়ে বংশী গুপীগঞ্জে এসে পৌঁছল। গত হাটবারেও শহরের সব দোকানে বংশী একখানা কাপড়ের জন্য প্রায় মাথা কোটাকুটি করেছে। রাগ ক'রে ভেবেছে আর আসব না, কিন্তু না এসে উপায় কি! কাপড় আজ জোটাতেই হবে।

পাড়া-গাঁ-ঘেঁষা ছোট গঞ্জ। হাটবার ছাড়া দুপুরের পরে আর কোন ভিড় থাকে না। সকালে বাজার মেলে দুপুরের আগেই একটু একটু ক'রে ভাঙতে শুরু করে। গরমের দুপুরে ঘুমোবার উপায় নেই, নকুল সা'র মুদী দোকানের সামনে যে অল্প একটু ছায়া পড়েছে সেখানে মাদুর পেতে গঞ্জের দোকানীরা খোলা গায়ে তাস খেলতে জড় হয়েছে। একজন খেলুড়ের কাঁধের ওপর তিন চার জন ক'রে দর্শক এবং পরামর্শদাতা এসে ঝুঁকে পড়েছে। চলতে চলতে বংশী সেখানে এসে থেমে দাঁড়াল। কাপড়ের দোকানের মালিক সুবল মল্লিকও আছে এই দলে।

বংশী তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলল, 'মল্লিক মশাই ও মল্লিক মশাই, একবার আসবেন একটু এদিকে?'

সুবল বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে তাকিয়ে বংশীকে দেখে আরও অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলল, 'কি বলছিস্?'

'আজ্ঞে একবার দোকানে যদি একটু আসতেন।'

'দোকানে! দোকানে এসে করব কি? এই পরশুদিন না ব'লে

দিলুম তোকে, কোনরকম কাপড়ই নেই, ভেবেছিস রাতারাতি গাড়ীতে গাড়ীতে কাপড় এসে হাজির হয়েছে, না?'

বংশী বলল, 'আজ্ঞে আট হাত হোক ন'হাত হোক কোনরকম একখানা শাড়ী যদি দিতেন—'

সুবল বাধা দিয়ে বলল, 'আমি গড়িয়ে দেবো, না? কাপড় কিনতে হয় গরমেণ্টের কাছে যা, থানায় যা, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যা। বেচা কেনা ব্যবসা বাণিজ্য দোকানদারদের হাত থেকে উঠে গেছে—বুঝলি?'

বংশী বলল, 'আজ্ঞে ঘরের মেয়েছেলের দিকে যে আর চাওয়া যায় না, কত্তা।'

কে একজন রসিকতা ক'রে বলল, 'তাহ'লে বাইরের মেয়েছেলের দিকে তাকাবি।'

বংশী তার দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুবলকে জিজ্ঞেস করল, 'কাপড় আসেনি তা'হলে?'

সুবল বিরক্ত হয়ে বল্‌ল 'না, না, কতবার বল্‌ব।'

বাকি যে দু' তিনটে কাপড়ের দোকান ছিল অন্য গলিতে, বংশী সেগুলিতেও একে একে চেষ্টা ক'রে দেখল। কিন্তু কোন মহাজনের ঘরেই কাপড় নেই। কাপড় চাইতে গেলে সবাই ধমকে উঠে, মারতে আসে। কত ভদ্রলোকের বউঝিরা আছে নেংটা হয়ে, তার চেয়ে ওর বউয়ের লজ্জা হ'ল বেশি।

ঘুরে ঘুরে দিন কেটে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত আজও কোন সুবিধা হ'ল না কাপড়ের। কোন্ মুখে দাঁড়াবে গিয়ে বউয়ের কাছে। চাঁপার কথা মনে হতেই বংশীর সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে বংশী আবার গঞ্জের একেবারে উত্তর প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। এখানে দোকান পাট বেশি নেই। কেবল একটা বিড়ির দোকান, আর একটা সোডালেমনেডের। পিছনে ঘনবদ্ধ কলাগাছের সারি। তার

ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ কয়েকটি আলোর রশ্মি এসে পড়েছে রাস্তায়। সেদিকে চেয়ে বংশী হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। শহরের পতিতা পল্লী।

ঠিক সেই সময় সুখদাও এল বিড়ি কিনতে। উদ্দেশ্য কেবল বিড়ি কেনাই নয়। নিজেকে বিজ্ঞাপিত করাও। কাল থেকে ঘরে কোন খদ্দের আসে নি। হঠাৎ দেশসুদ্ধ লোক যেন সচ্চরিত্র হয়ে গেছে।

সুখদা যতক্ষণ ধ'রে বিড়ি কিনল, বিড়িওয়ালার সঙ্গে হেসে হেসে রসিকতা করল, বংশী অপলকে তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কমলা রঙের শাড়ীখানি ভারি চমৎকার মানিয়েছে। সুখদাও তার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে সামনের কলা বাগানের দিকে এগিয়ে গেল।

বংশী খানিকক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর দ্রুত পায়ে সুখদার পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। আরও দু-তিনটি মেয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের অতিক্রম ক'রে সুখদা বংশীকে একেবারে নিজের ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল, তারপর একটু মিষ্টি হেসে বলল, 'অতক্ষণ ধ'রে কি ভাবছিলে বল দেখি? যাবো কি যাবো না—নয়? না এসে কি আর জো আছে!'

তারপর অদ্ভুতভাবে হাসে মেয়েটি।

বংশী বলল, 'জো নেই?'

'বাবারে বাবা—আবার তর্ক করে। বাইরে কেন, ঘরের ভিতরে এসে যত খুসি তর্ক করো না। কতক্ষণ বসবে?'

'বেশীক্ষণ নয়।'

বাব্‌বা! ও বেলায় দেখি জ্ঞানের নাড়ী খুব টনটনে। তা' যতক্ষণই হোক দু'টাকার কমে কিন্তু পারব না, দেখছ না জিনিসপত্রের কি দর। এসো।'

বংশী পিছনে পিছনে গিয়ে ঘরে ঢুকল। মেঝেতে পাতা বিছানা। সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সুখদা বলল, 'বোস, অমন আড়ষ্ট হয়ে রইলে কেন গো, হাত পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে বোসো না।'

বংশী বলল, 'এই তো বসেছি।'

তারপর বংশী ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। টিনের ছোট একটি খুপরী—পাখির খাঁচার মত ঘর। আসবাবপত্রের মধ্যে খানকয়েক বাসন কোসন, পান খাওয়ার সরঞ্জাম, দেয়ালে টাঙানো ছোট মত একখানা আয়না, আর দড়িতে ঝুলানো একখানা জীর্ণ গামছা।

সুখদা তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে হাসল, 'ধন দৌলত দেখছ বুঝি ঘরের। কিছু নেই—ওবারের দুর্ভিক্ষে সব বেচে খেতে হয়েছে। তারপর হ'ল অসুখ'....হঠাৎ সুখদা থেমে গেল, তারপর বলল, 'দেরি করবে না-কি বেশি? তাহলে কিন্তু আরো বেশি লাগবে।'

বংশী অদ্ভুত একটু হাসল, 'তা হলে আর দেরি করে লাভ কি।' সুখদা হাত পেতে বলল,'তবে—'

বংশী ট্যাঁক থেকে দু'খানা এক টাকার নোট সুখদার হাতে ফেলে দিল।

সুখদা উঠে পড়ল। দড়ি থেকে গামছাটা পেড়ে নিয়ে শাড়ীখানা বদলে সযত্নে দড়িতে আবার টাঙিয়ে রাখল, তারপর বিছানায় এসে বসল—বলল, 'ওমা, ওদিকে যাচ্ছ কেন?'

বংশী ততক্ষণ এক লাফে উঠে দড়ি থেকে শাড়ীটা পেড়ে বগলে পুরেছে।

সুখদা সেদিকে চেয়ে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা কোথায় যাব গো! এই জন্যই ঘরে এসেছ না কি তুমি!' বংশীকে বিনা বাক্যে দোরের দিকে এগুতে দেখে সুখদা তাকে গিয়ে একেবারে জাপটে ধরল, তারপর খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ও পদ্ম ও বিন্দি—'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বংশী মুখ চেপে ধরল সুখদার, এবং হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে টান দিয়ে তার পরনের গামছা খুলে নিয়ে শক্ত ক'রে মুখ বেঁধে ফেলল। সুখদা হাত দিয়ে সেই বাঁধন খুলবার চেষ্টা করছে দেখে একহাতে তার দুটো হাত জোর ক'রে ধ'রে আর এক

হাতে বেড়ায় টাঙানো দড়িটা ছিঁড়ে নিয়ে কষে দু'হাত বেঁধে ফেলল সুখদার। ধস্তা ধস্তিতে সুখদা ততক্ষণে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে গেছে। এতক্ষণে বংশী নিশ্চিন্ত। শাড়ীটা বগলদাবা ক'রে মৃদু হাস্যে একবার সুখদার দিকে তাকাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। চোখের সামনে সেই উলঙ্গ অনাবৃত নারী-দেহ। হঠাৎ এই রকম আর একটা অসহায় দেহ মনে পড়ে গেল। কিন্তু এ যে আরো দুঃসহ আর কুশ্রী আরো কদর্য। শাড়ী পরবার ধরণে যাকে আঠার উনিশ বছরের যুবতী বলে মনে হয়েছিল, অনাবৃত দেহে তার শিথিল চর্ম প্রৌঢ়ত্ব বেরিয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় সর্বাঙ্গে চাকা চাকা ক্ষতচিহ্ন বুকের উপর বিকৃত, বিস্তীর্ণ দুটি মাংসপিণ্ডের মাথায় বড় বড় দু'খানা ঘা থক্ থক্ করছে।

মুহূর্তকাল আড়ষ্ট কুঞ্চিত দেহে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বংশী। তারপর হঠাৎ দুই চোখ বুজে সেই কমলা রঙের শাড়ীখানা ছুঁড়ে দিল সুখদার কুৎসিত দেহটার ওপরে।

ততক্ষণে পদ্ম আর বৃন্দারা রুদ্ধ দ্বারের কাছে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে আর পিছনে পিছনে এসে পৌঁচেছে থানার নরহরি কনেস্টবল।

রবিবারের সকাল। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মিশনের বড় হল ঘরটায় পাড়ার গণ্যমান্য ভদ্রলোকের ভিড় বেড়ে চলেছে। রায়বাহাদুর হৃদয়বিকাশ, হিন্দুরক্ষা সমিতির সহ-সম্পাদক জগৎ চৌধুরী, বালিগঞ্জ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিভুতি দত্ত-গুপ্ত, পাড়ার হাইস্কুলের হেড মাষ্টার হীরেন সোম, একে একে সবাই এসে পৌঁচেছেন। প্রত্যেকেই মিশনের শুভাকাঙ্খী এবং পৃষ্ঠপোষক। কেউ কেউ পরিচালক সমিতির সদস্যও আছেন। সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে প্রত্যেকেরই নানা বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, নিঃশ্বাস ফেল্‌বার ফুরসৎ থাকে না। রবিবারের এই সময়টাতে তবু খানিকটা অবকাশ মেলে! একটু অসাংসারিক, একটু অবৈষয়িক পরিবেশে মনকে মেলে ধরে তবু খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়া যায়।

চা, সিগারেট, খবরের কাগজ এবং আধা-আধ্যাত্মিক আলোচনায় বৈঠক বেশ জমে উঠেছে। অধ্যক্ষ স্বামী অখিলাত্মানন্দ প্রত্যেককেই স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন; পারিবারিক কুশল সম্বন্ধে ঔৎসুক্য এবং কারো অসুখ-বিসুখের খবর শুনলে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, বিষয়বস্তুভেদে আলোচনার যে দু'তিনটি ধারা চলেছে তার সব-কটির সঙ্গেই নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখছেন, আবার গেরুয়াধারী যে তরুণ টাইপিষ্ট ব্রহ্মচারীটি অফিসের কয়েকখানি জরুরী চিঠিপত্র টাইপ করছে ফাঁকে ফাঁকে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ-ও দিয়ে আসছেন।

কিশোরবয়সী আর একজন নবীন ব্রহ্মচারী এসে ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকল এবং স্বামীজীর সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে জানাল একটি মেয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে।

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ে ? কি চায় ?'

'আমাদের অবলাশ্রমের নাম শুনে এসেছে। আশ্রয় চায়।'

মহিলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক স্বামী প্রকাশানন্দই এসব ব্যাপারের বিধিব্যবস্থা করেন। কিন্তু একটা জরুরী কাজে কাল তিনি শিলং রওনা হয়ে গেছেন। তাঁর স্থানে অফিসিয়েট করার মত সন্ন্যাসী কিংবা ব্রহ্মচারীদের মধ্যে প্রবীন বিচক্ষণ কেউ বর্তমানে উপস্থিত নেই। স্বামীজী মুহূর্তকাল কি একটু ভেবে বললেন, 'আচ্ছা উপাসনা ঘরের পাশের ঘরটিতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসতে বলো। একটু পরেই আমি যাচ্ছি।'

ঘাড় নেড়ে সশ্রদ্ধ সম্মতি জানিয়ে ব্রহ্মচারীটি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। কিন্তু চৌকাট পেরোতে না পেরোতেই তার বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'এই যে, আপনি এখানেই চলে এলেন যে! স্বামীজী আপনাকে ও-ঘরে অপেক্ষা করতে বলছেন, চলুন।' কাতর নারীকণ্ঠে উত্তর এলো, 'অনেকক্ষণ ধরেই যে অপেক্ষা করছি বাবা।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'স্বামীজী ইচ্ছা করলে এ ঘরে ওঁকে আসতে বলতে পারেন। আমাদের সবারই তো চুল এখানে পাকা।'

বিভূতবাবু বললেন, 'কারো বা দু'আনি, কারো বা দশ আনি এই পার্থক্য।'

স্বামীজী ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এখানেই নিয়ে এস।'

বয়স বছর তেইশ চব্বিশ হবে। পাড়াগাঁয়ের নিম্নশ্রেণীর মেয়ে বলে প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে যে শারীরিক গড়নকে নিতান্তই ভোঁতা মনে হোত, অমার্জিত রুচি এবং অশিক্ষার পুরু প্রলেপে যে মুখশ্রী চোখেই পড়ত না, কিংবা পড়লেও চোখকে পীড়িতই করত, শীর্ণ এবং রুক্ষ হয়ে হঠাৎ যেন তাতে অদ্ভুত একটু তীক্ষ্ণতা এসেছে। ক্লিষ্ট রোগজীর্ণ মুখে এই সামান্য লাবণ্যটুকু

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বলেই চোখকে যেন তা একটু অকস্মাৎ বেশি-মাত্রায় আকর্ষণ করে।

মেয়েটি একা নয়। ভাঁজকরা ময়লা কাপড়ে জড়ানো একটি শিশুও আছে কোলে। আকৃতি দেখে মনে হয়, বয়স এখনো মাস পোরেনি। পরনে আধ-ময়লা খাটো একখানা শাড়ি। সবুজ লতা-পাতার পাড়। কিন্তু এই পাড়টুকু ছাড়া আর কোথাও কোন সধবার লক্ষণ নেই। সমস্ত অঙ্গ নিরাভরণ। সিঁথিতে কি কপালে সিঁদুরের কিছুমাত্র চিহ্ন চোখে পড়ে না। শাড়ির লতানো পাড়টিকে হয় তো সেইজন্যই একটু বিসদৃশ বলে ঠেকে। শাড়ির আঁচল কপাল পর্যন্ত নামেনি। বোধ হয় নামবে না বলে সে চেষ্টাও আর করা হয়নি।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি মেঝের উপরই বসতে যাচ্ছিল। স্বামীজী পাশের সরু টুলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'আহা-হা মাটিতে কেন, ওর ওপরে বসো।'

টুলের এক কোণে গিয়ে মেয়েটি আড়ষ্টভাবে বসলে স্বামীজী জিজ্ঞসা করলেন, 'কোত্থেকে তুমি আসছ মা?'

মেয়েটি বলল, 'ভুবনবাবুর বাড়ি থেকে।'

'ভুবনবাবু কে? তাঁর বাড়িই বা কোথায়?'

'আমি তাঁর ওখানেই ছিলাম।'

স্বামীজী বললেন, 'তাতো বুঝতে পারছি। কিন্তু তিনি থাকেন কোথায়?'

'এই কলকাতাতেই থাকেন বাবা।'

জগৎবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'আহা কথা কেন বাড়াচ্ছ? কোন রাস্তায় কত নম্বর তাই আমরা জিজ্ঞেস করছি।'

মেয়েটি বলল, 'তা তো জানিনে বাবা।'

জগৎবাবু মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'রাস্তার নামও জানো না, নম্বরও জানো না? কতদিন কলকাতায় আছ সত্য ক'রে বল দেখি।'

মেয়েটি মুখ নীচু ক'রে বোধ হয় মনে মনে হিসাব করল তারপর বলল, 'সাত আট মাস।'

জগৎবাবু একটু হাসলেন, 'সাত আট মাস ধ'রে কলকাতায় আছ অথচ যেখানে থাকতে তার ঠিকানা জানো না, একথা কি সত্য ব'লে আমাদের বিশ্বাস করতে বলো। ভুল করেছ। সময়টা আর একটু কম ক'রে বললে ভালো করতে।'

এ কথার জবাব না দিয়ে মেয়েটি মুখ নীচু ক'রে চুপ করেই রইল।

রায় বাহাদুর প্রসঙ্গান্তরে গেলেন, 'আচ্ছা মা, তোমার কোলে ওটি কি? ছেলে, না মেয়ে?'

'ছেলে, বাবা।'

'বেশ, বেশ, দীর্ঘায়ু হোক, স্বাস্থ্যবান হোক, পণ্ডিত হোক, যশস্বী হোক।'

জগৎ চৌধুরী মৃদু হেসে বললেন, 'আর রায়বাহাদুরিটা বাদ পড়ল কেন। ওটা বুঝি পরের ছেলের জন্য কামনা করতে মন সরে না?'

জগৎবাবু রায় বাহাদুরের সমবয়সী এবং বিশিষ্ট বন্ধু। রায় বাহাদুর তীক্ষ্ণ একটু হাসলেন, 'রামঃ, রামঃ, সরকারী খেতাবে আজকাল কি কোন বাহাদুরি আছে ভাই, ও কেবল দশজনের দুয়ো কুড়োবার জন্য। তার চেয়ে জাতকের জন্য জাতির নেতৃত্বপদ কমনা করি। আশীর্বাদের কিছুটাও যদি ফলে, অন্তত উপ বা সহটুকুও যদি সঙ্গে থাকে, তাহলেই যথেষ্ট। সভায় সমিতিতে মালা আর হাততালির অভাব হবে না।'

হাস্যের সঙ্গে একটু ভিন্নার্থবোধক উপসর্গের যোগ হচ্ছে দেখে

বিভূতিবাবু তাড়াতাড়ি পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, 'ছেলেটি তো তোমার ভারী সুন্দরই হয়েছে দেখতে, আচ্ছা, ওর বাপ কোথায় বাছা?'

মেয়েটি একবার সকলের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নিচু করল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।'

সকলেই সমস্বরে আপশোষ জানালেন, 'ঈস্‌স্‌, আহাহা।'

একটু পরে জগৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দিন হ'ল? কবে ঘটল এই দুর্ঘটনা?'

সেও মাস সাতেক হ'ল বাবা। ও তখন তিন মাসের পেটে।'

সকলেই পরস্পরের দিকে তাকালেন।

জগৎবাবু মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'দেখলেন, এবার আর হিসাবে ভুল হয়নি।'

স্বামীজী বললেন, 'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কেউ এসেছে? কে তোমাকে রেখে গেল ওখানে?'

'ভুবনবাবুর মুহুরী।'

'মুহুরী? কই তিনি?'

'চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন? কেন, এতদূর পর্যন্ত সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে পারলেন, আর এইটুকু তাঁর সবুর সইলো না? আমাদের সঙ্গে দেখা না ক'রেই গেলেন? জেনে গেলেন না তোমাকে আমরা রাখি কি না রাখি।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'Perhaps that devil himself is the culprit.'

মেয়েটি বলল, 'মুহুরীবাবু বললেন, ওখানে গেলেই তুমি থাকতে পাবে। আমার অনেক কাজ আছে। আমি এখন যাই, আর এসব ব্যাপারে মিশনওয়ালারা নাকি অনেক অকথা কুকথা সব জিজ্ঞাসা করে। বুড়ো ব্রাহ্মণ মানুষ। সে সব আমার কানে সইবেই না।'

আবার সকলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন।

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, সেই ভুবনবাবুর কোন চিঠি আছে তোমার কাছে ?'

'না বাবা, চিঠিপত্র তো কিছু নেই।'

'হুঁ, আচ্ছা এতদিন তুমি সেখানে থাকতে পারলে, আর হঠাৎ আজই বা তোমাকে তাঁরা এই আশ্রম দেখিয়ে দিলেন কেন ? সেখানেই তো থাকতে পারতে।'

মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, 'গিন্নীমা অবশ্য অনেকদিন আগে থাকতেই চলে যেতে বলছিলেন। শেষে ও যখন হ'ল তখন কিছুতেই আর রাখলেন না। বললেন, আমার অবিবিয়েত সোমত্ত সব ছেলে। পাড়ার শত্তুররা এরই মধ্যে কত কি বলাবলি আরম্ভ করেছে। তোমাকে আর আমি রাখতে পারিনে বাছা। তুমি এক আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে থাক।'

জগৎবাবু একটু বিশেষ অর্থবাচক দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন। তারপর একটু মৃদু হেসে আবার সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার গিন্নীমার পাড়ার শত্তুররা যা বলাবলি করত সেটা সত্যি কি মিথ্যা তাই জানতে চাইছি।'

মেয়েটি কোনো জবাব দেবার আগে হঠাৎ হেডমাষ্টার হীরেনবাবু অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন, 'আপনার জ্ঞানের পিপাসা অসাধারণ জগৎবাবু। কিন্তু ব্যাপারটা কি মেয়েটিকে দিয়ে একেবারে স্বীকার না করিয়ে নিলেই নয়। না এই মুখরোচক আলোচনা কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না ?'

জগৎবাবু ক্রুদ্ধভাবে একবার হেডমাস্টারের দিকে তাকালেন কিন্তু পরক্ষণেই মুখে অদ্ভুত একটু হাসি টেনে বললেন, 'মাস্টারমশাই, পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপার যদি মাস্টারীর মত অমন সহজ হোত তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। মুখরোচক আলোচনাটা ছাড়তে পারছি না তা ঠিকই। কারণ সত্য ঘটনা যথাযথ আমাদের জানা দরকার। এ নিয়ে পুলিসের হাঙ্গামা আছে। তাছাড়া কে প্রকৃত দোষী তা জেনে

যদি সম্ভব হয় এই প্রতিষ্ঠান থেকে তার প্রতিবিধানও আমরা ক'রে থাকি। আপনাদের মত Puritan হয়ে অন্যায় দুষ্কৃতি দেখে চোখে বুজে থাকি না। শুচিতা রাখতে চাই বলেই শুচিবায়ুতা আমাদের ছাড়তে হয়।'

হীরেনবাবু হাসলেন, 'লোকে বলে মাস্টারেরা নাকি স্কুল ঘরের বাইরেও তাদের মাস্টারীর অভ্যাস ছাড়তে পারে না। সমস্ত পৃথিবীটাকে তারা তাদের পাঠশালা মনে করে। মাস্টারদের তরফ থেকে এ দোষ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমার মনে হয়, দোষটা কেবল আমাদের মাস্টারদেরই নয়। অভ্যাসটা সকলেরই আছে। অভিনেতাদের কাছে গোটা জগৎটাই রঙ্গমঞ্চ, আর নেতাদের কাছে বক্তৃতামঞ্চ— এইটুকু যা তফাৎ। সম্পূর্ণ সত্য যখন না জানলে আপনার চলছে না তখন মেয়েটিকে আড়ালে নিয়ে ও সব কথা খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করুন। এই হাটের মধ্যে একটি মেয়েকে এ ধরনের প্রশ্ন করা আপনার শুচিতায় না বাধতে পারে, কিন্তু ভদ্রতায় বাধা উচিত ছিল। স্বামীজী, তার চেয়ে আলাদা নিরিবিলি একটা ঘর দেখিয়ে দিন না জগৎবাবুকে।'

রায় বাহাদুর হেসে উঠলেন, 'এতক্ষণে একটা দারুণ hit দিয়েছে মাষ্টার।'

জগৎবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হীরেনবাবু, আপনার কুশ্রী এবং অশ্লীল ইঙ্গিতে আমি অত্যন্ত আপত্তি করছি। এতক্ষণ ধ'রে আপনিই না শুচিতা আর ভদ্রতার বড়াই করছিলেন!'

হীরেনবাবু বললেন, 'কোন কুশ্রী ইঙ্গিত করবার সত্যিই কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'

স্বামীজী বিব্রতভাবে বললেন, 'আঃ কি আরম্ভ করলেন হীরেনবাবু। দয়া ক'রে চুপ করুন। কেন নিজেদের মধ্যে মিছামিছি—বরং আসুন, উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে একটা ইতিকর্তব্যতা ঠিক করা যাক।'

জগৎবাবু বললেন, 'আমি আর ওর মধ্যে নেই মশাই। বিষয়টা যখন আপনারই জুরিস্‌ডিকসনে তখন কি করবেন না করবেন আপনি

নিজেই ঠিক করুন। তবে প্রকৃত তথ্য আমাদের জানা দরকার এইটুকু কেবল আমার কথা।'

স্বামীজী বললেন, 'সে তো নিশ্চয়ই।'

তারপর তিনি বিস্মিত এবং বিমূঢ় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সস্নেহে অত্যন্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলা আরম্ভ করলেন, 'শোনো মা, একবার যখন এখানে এসে পড়েছ তোমার আর কোন ভয় নেই, কোনো চিন্তা ভাবনা আর তোমাকে করতে হবে না। ব্যবস্থা সাধ্যমত আমরা করবই। প্রাণ থাকতে কোন অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সব রকমের ব্যবস্থাই এখানে আছে। এখানে মেয়েদের আমরা লেখাপড়া শেখাই—অবশ্য যে যতটুকু গ্রহণ করতে পারে—তারপর আছে হাতের কাজ। যাতে তোমরা নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পার, ভবিষ্যতে দাসীবৃত্তি কিংবা আর কোন জঘন্য উপায়ের আশ্রয় কিছুতেই যাতে তোমাদের আর না গ্রহণ করতে হয়, সেজন্য আলাদা একটা বাড়ি নিয়ে তাঁত বসিয়েছি সেখানে। ইচ্ছা করলে সেসব কাজ শিখতে পারবে। শীঘ্রই আর একটা কারখানা খোলা হবে যাতে ছোটখাট চামড়ার কাজও শেখাবার ব্যবস্থা করব। তারপর আবার যারা গৃহাশ্রমে ফিরে যেতে চায় তাদের জন্য সে ব্যবস্থাও আছে। দেখে শুনে এসব মেয়েদের ফের আমরা বিয়ে দিয়ে দি। কিন্তু এই আশ্রমে ঢুকবার আগে তোমাকে যে সমস্ত সত্য কথা অকপটে আমাদের কাছে খুলে বলতে হবে মা।'

মেয়েটি বলল, 'খুলে তো আমি সবই বললাম।'

স্বামীজী পূর্ববৎ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'না মা, সব হয়তো ঠিক বলোনি। বলা যে সহজ নয় তা মানি। কিন্তু কেন বলতে পারবে না? অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা কিছু খুলে বলতে পারোনি বলেই তো তোমাদের এই দশা। সংসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে হবে, দোষ তোমাদের নয়, দোষ দুর্বৃত্তদের, দোষ সেই ভীরু কাপুরুষদের। এখানে তোমার মত অনেকেই আছে মা। যতদূর আমি

'জেনেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নিজেদের কিছুমাত্র দোষ নেই। কেউ বা অভাবের তাড়নায় নিতান্ত পেটের দায়ে এভাবে স্খলিত হয়েছে, কাউকে বা নিজেরই কোন নিকট আত্মীয় নানা লোভ দেখিয়ে টেনে এনে এই সর্বনাশের পথে নিঃসহায়ভাবে ফেলে গেছে। সব তুমি খুলে বলো, কোন ভয় নেই তোমার, কোন লজ্জার কারণ নেই, সমস্ত লজ্জা আর গ্লানি সেই সুযোগান্বেষী, সুবিধাবাদী পাষণ্ড পুরুষের, তোমার কিসের লজ্জা মা। আচ্ছা, এখানে যদি সংকোচ বোধ কর, তুমি বরং ঐ ঘরে চলো, সেখানে সব কাহিনী খুলে বলবে, দেখি কোন বিধান আমরা করতে পারি কিনা। এসো মা, আমার সঙ্গে বরং ওঘরে চলো—'

মেয়েটি মুখ তুলে একবার সকলের দিকে তাকাল তারপর স্বামীজীর দিকে চেয়ে বলল, 'অন্য ঘরের দরকার নেই, আমি এখানেই সব বলতে পারব।'

স্বামীজী বললেন, 'কিন্তু ও ঘরে গেলেই তো ভালো হয়, এক্ষেত্রে মেয়েদের একটু লজ্জা তো খুবই স্বাভাবিক।'

মেয়েটি শান্তভাবে বলল, 'না আমার কোন লজ্জা করবে না আপনারা যা ভেবেছেন তাই ঠিক। এ ছেলে আমার স্বামীর নয়।'

এই অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তিতে সকলেই যেন চমকে উঠলেন।

জগৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে কার?'

'তা জানি না।' মেয়েটির কণ্ঠে যেন একটু ক্ষেদের আভাস।

জগৎবাবু হাসলেন, 'এই তো, আবার মিথ্যা বলতে শুরু করলে! তুমি জানো না সে কি ক'রে সম্ভব? কথায় বলে মনের অগোচরে পাপ নেই আর মায়ের অগোচরে—'

হীরেনবাবু তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই জগৎবাবু তাড়াতাড়ি থেমে গেলেন।

মেয়েটি যেন তৎক্ষণাৎ তার কথার ভুল বুঝতে পারল। একটু

চুপ ক'রে থেকে বলল, 'অগোচরে থাকবে না কেন, এতো আর একজন দুজন নয়, যে খেয়াল থাকবে।'

জগৎবাবু অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে বললেন, 'ও তাই বলো। ক'জন ছিল, কে কে তারা।'

মেয়েটি আর একবার মুখ তুলল। তারপর বেশ সহজ অকুণ্ঠ-ভাবে বলল, 'বাবুর ছেলেরা ছিলেন তিন ভাই—'

জগৎবাবু বলে উঠলেন, 'Good God! All of them! আর,—এরপরও আবার কেউ ছিল নাকি?

মেয়েটি একবার বুঝি একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'হাঁ, সেই বুড়ো মুহুরীবাবুও।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'Just see!'

জগৎবাবু বললেন, 'আশ্চর্য, আর তুমি সকলের অত্যাচারই মুখ বুজে সহ্য ক'রে গেলে, কোথাও সরে আসতে পারলে না?'

মেয়েটি জগৎবাবুর দিকে সোজাসুজি তাকাল, তারপর বলল, 'স'রেই তো আপনাদের কাছে এলাম বাবু।'

হঠাৎ কথাটা কেমন যেন একটু অশ্লীল ব'লে মনে হ'ল জগৎবাবুর কাছে। কিন্তু তখনই প্রতিবাদ করার মত কোন জবাবও যেন তিনি খুঁজে পেলেন না। এমন কি একটা ধমক পর্যন্ত তার মুখে জোগাল না। তার পরিবর্তে স্বামীজীর দিকে চেয়ে বললেন, 'শুনলেন তো সব। এবার নামধামগুলি জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নিন। তারপর যা ব্যবস্থা হয় করুন। ইতিহাস যা শুনলুম, তাতে তো খুব অসহায় ব'লে মনে হয় না। কিছুদিনের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন, সেই জন্যই বোধ হয় এখানে আসা। চলুন রায় বাহাদুর, বেলা অনেক হ'ল।'

সকলেই উঠে পড়লেন। স্বামীজী তাঁদের পিছনে পিছনে আশ্রমের সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন।

তারপর ফিরে এসে ঘরে ঢুকে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। মেয়েটি

শিশুসন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মাঝে মাঝে দু'এক ফোঁটা জল শিশুটির গায়ের ওপর ঝরে পড়ছে।

স্বামীজী একটু যেন চমকে উঠে বললেন, 'কি হ'ল তোমার ছেলের? অসুখ ছিল নাকি ওর?'

মেয়েটি জলেভরা দুটি চোখে অসহায়ভাবে স্বামীজীর দিকে তাকাল, 'না বাবা, অসুখ নয়, পরের ওপর রাগ ক'রে আমি যে ওকে অপমান করলাম।'

স্বামীজী বিস্মিত হয়ে বললেন, অপমান করলে কি ক'রে?'

'হাঁ, বাবা। গায়ের রাগে মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে আমি যে ছেলের মান খোয়ালুম, স্বামীর মান খোয়ালুম! আমার যে নরকেও স্থান হবে না বাবা।'

স্বামীজী একটু যেন চমকে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'না মা, অপমান কেবল তুমি তাদেরই করোনি।'

শ্রীপতির সংসার ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে দু'জনের মতভেদটাই প্রথম বছর কয়েক শাশুড়ী বউয়ের ঝগড়ার প্রধান স্থান দখল ক'রেছিল। অন্য কোন তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে কথান্তর আরম্ভ হলেও কলহটা তুমুল হয়ে উঠত সেই পুরাতন এবং অপরিবর্তনীয় মতানৈক্যে।

হেমাঙ্গিনী বলতেন, 'তোর জন্যই তো এমন হ'ল দিনরাত কেবল খাই খাই, 'দাও দাও' করেই তো বাছাকে তুই ভিটেছাড়া করলি, না হ'লে এমন ভরা সংসার, এমন কচি কচি ছেলে মেয়ে ফেলে কেউ বিবাগী হয়ে পথে বেরোয়? এই কি তার বিবাগী হওয়ার বয়স?'

পুত্রবধূ সরমা জবাব দিত, 'ঘর যে সে কার জন্য ছেড়েছে সে কথা দেশসুদ্ধ লোক জানে, রাতদিন তো কেবল এই মন্ত্র দিয়েছো বউয়ের এটা ভালো না ওটা খারাপ, খাওয়ার জিনিস দেখলে জিভ দিয়ে জল পড়ে, পরপুরুষ দেখলে চোখের পলক পড়ে না। সতীন হয়েও যা মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে না, শাশুড়ী হয়ে তুমি তাই করেছ। ঘেন্নায় মরে যাই। এখন মন্ত্র জপ না কানে, মনের সাধে ঘর কর না ছেলে নিয়ে? আমি যদি তাকে ঘরছাড়া ক'রে থাকি, বেশ করেছি উচিত করেছি।'

হেমাঙ্গিনী প্রতিবাদ ক'রে বলতেন, 'এ সব কথা আমি বলেছি? তোর নিজের মনে আছে পাপ, আর বদনাম দিচ্ছিস আমার নামে, হে ভগবান, হে আকাশের চন্দ্র সূর্য তোমরাই সাক্ষী।'

সরমা এর পর হঠাৎ একটু হাসত, 'থাক, থাক, তাদের চেয়েও বড় সাক্ষী আছে আমার দুটো কান, তবু যদি নিজের কানে না শুনতাম।'

হেমাঙ্গিনী এক মুহূর্ত অবাক হয়ে পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে

থাকতেন। ঝগড়ার মাঝখানে কণ্ঠকে নীচু পর্দায় নামিয়ে এমন মধুর করে একটু হাসবার অপূর্ব কৌশল শুধু যে তিনিই জানেন না তাই নয়, সরমা ছাড়া আর কাউকে এমন কৌশল অবলম্বন করতে তিনি দেখেনও নি। কিন্তু না দেখলে হবে কি, এটুকু তাঁর বুঝতে বাকি থাকত না যে এই এককোঁটা হাসির কাছে তাঁর সমস্ত ঝাঁঝালো কটুবাক্যই নিতান্ত জোলো এবং হাস্যকর হয়ে গেছে।

কিন্তু দু'একটি বছর ঘুরে আসতে না আসতেই ঝগড়ার বিষয়টা বদলাতে শুরু করল। শ্রীপতির কথা প্রায় ওঠেই না। সরমা আজ কাল বলে, 'লজ্জা করা উচিত। আমার বাবা হাত তুলে দু'মুঠো দেয় তবে এক সন্ধ্যা জোটে। এর পরও জোট বেঁধে ঝগড়া করতে আসতে আমি তো পারতুম না। একবার ভেবে দেখতুম এতখানি গলার জোর কার ভাতের জোরে।'

কথাগুলি হেমাঙ্গিনীর বুকে গিয়ে বাজে। একমুহূর্ত তিনি যেন কথা খুঁজে পান না। তারপর আবার শুরু করেন, 'থাক বড়লোক বাবার বড়াই আর করিসনে, মাস অন্তে পাঠায় তো দশটি টাকা তাতে তোর আর তোর ছেলে মেয়েরই কুলোয় না, তা আবার অন্যে খাবে। কত বড় অন্তর কত বড় বিবেচনা তোর বাপের। ও গল্প পাড়ায় গিয়ে করিস, আমার কাছে করতে আসিস না। আমি আমার স্বামী শ্বশুরের ভিটায় থাকি। তাঁরা যা রেখে গেছেন তাতেই আমার চলে। তোর বাপের খরচ তুই-ই খাস আর কেউ তা বাঁ পায়েও ছোঁয় না।'

স্বামী-শ্বশুরের সম্পত্তি হিসাবে বিঘা তিন চারেক ধানী জমি, বাড়ীর লাগা একটা বাঁশঝাড় এদের আছে। ধান যা পাওয়া যায় তাতে মাত্র বছরের মাস দুই অড়াই যায়, আর বাঁশঝাড়ের বাঁশ বিক্রি করেও সামান্য কিছু হয়। না হ'লে কেবল সরমার বাবা হীরালাল বোসের প্রেরিত দশটি টাকায় চারটি ছেলেমেয়ে এবং দুটি স্ত্রীলোকের চলবার কথা নয়। সরমাও তা বোঝে। সত্যি বলতে কি সচ্ছল পিতা তার সম্বন্ধে যে এমন অবিবেচক এবং কৃপণ হবেন তা সে ধারণায় আনতে

পারে নি। পাছে সে আরও টাকা দাবী করে, কিংবা ছেলেমেয়ে নিয়ে দু-চার মাস বাপের বাড়িতে আসবার ইচ্ছা জানায় সেই ভয়েই যে তার বাবা এই বছর কয়েকের মধ্যে একবার এসে খোঁজটি পর্যন্ত করেন নি তা সে জানে। এর জন্যে বাপকেও সে ক্ষমা করে না। বাপের বাড়ীর সম্পর্কে অন্য যে দু'একজন আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের সঙ্গে কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ কি চিঠিপত্রের বিনিময় হলে বাপের হৃদয়হীনতা সে নির্মমভাবেই সকলের কাছে প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীকে খোঁটা দেওয়ার সময় এই দশ টাকাই হাজার টাকার কাজে আসে। আর এই সব কথা প্রায়ই তোলে খাওয়ার সময় সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সেরে, সরমা ছেলেমেয়েদের নাইয়ে খাইয়ে দিয়ে বেলা দুটো আড়াইটেয় হেমাঙ্গিনী যখন হবিষ্য করতে বসবেন ; সরমা, যেন সেই সময়টার দিকে তাক করে থাকে। এমন দিন খুব কমই যায় যেদিন ভাতের পাথরে হেমাঙ্গিনীর চোখের জল পড়ে না।

সরমা নির্বিকারভাবে নিজের এই নির্মমতা উপভোগ করে। তার কথার ঝাঁজে হেমাঙ্গিনীর মত মানুষেরও যে চোখ দিয়ে জল বেরোয় এ যেন সরমার এক পরম কৃতিত্ব! যে ক্রূর ভাগ্য তার সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছে তার প্রতিনিধি যেন সমস্ত একমাত্র হেমাঙ্গিনী। সমস্ত অন্যায় সমস্ত অবিচারের প্রতিশোধ হেমাঙ্গিনীকে নির্যাতনের দ্বারাই যেন নিবৃত্ত হবে। আর যদি কোন দোষ তাঁর না-ও থাকে, এই তো যথেষ্ট যে শ্রীপতিরই মা হেমাঙ্গিনী, যে শ্রীপতি চারটি শিশুসন্তান আর নিঃসহায় যুবতী স্ত্রীকে এমন ক'রে ফেলে রেখে বেরিয়ে যেতে পারে! কী এমন পাপ করেছে সরমা যে তার জীবন এমন ক'রে ব্যর্থ হয়ে গেল? এ প্রশ্নের জবাব যে-ভাবেই হোক শ্রীপতির মা হেমাঙ্গিনীর কাছ থেকেই সরমা আদায় করে ছাড়বে। কেন না শ্রীপতিকে জিজ্ঞেস ক'রে এর কোন উত্তর মেলে নি। সম্পর্কিত এক দেবরকে সঙ্গে ক'রে শ্রীপতির আশ্রম পর্যন্ত সরমা ধাওয়া ক'রেছিল। স্বামীর সহস্র

বাধা সত্ত্বেও তাঁর পায়ের উপর মুখ রেখে সরমা জিজ্ঞেস ক'রেছিল, 'সত্যি ক'রে আমার গা ছুঁয়ে বল, কি দোষে তুমি ঘর ছাড়লে? কী দোষ দেখলে তুমি আমার?'

মাথা মুড়ে, কষায় বস্ত্র পরে শ্রীপতি তার কিছুদিন আগে সন্ন্যাস নিয়েছে। সন্ন্যাসীজনোচিত শান্ত কণ্ঠে এবং স্মিতহাস্যে সে জবাব দিয়েছিল, 'তোমার তো কোন দোষ নেই সরমা?'

'তবে মা যে বলেন আমার স্বভাবচরিত্রে তোমার সন্দেহ এসেছিল। বল, তোমাকে ছাড়া এমন কোন পুরুষের সঙ্গে—'

শ্রীপতি জবাব দিয়েছিল, 'ছিঃ, মার ধারণা অত্যন্ত ভুল।'

সরমা কিছুটা আশান্বিত হয়ে বলেছিল, 'তবে? টাকা-পয়সা জিনিষপত্রের জন্য তোমাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করছি বলেই কি— কিন্তু সে তো তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্য, তোমার সংসারের জন্য। আচ্ছা, তুমি ফিরে চল। আমি আর কোন কিছু যদি তোমার কাছে চাই। তুমি শুধু ফিরে চল।'

শ্রীপতি তেমনি স্মিতহাস্যে বলেছিল, 'এ তোমার অত্যন্ত ছেলে-মানুষের মত কথা হ'ল সরমা। সংসারী মানুষ তো ওসব চাইবেই। তুমি নিশ্চিত থেক, আমি যে সংসার ত্যাগ করেছি সে তোমার কোন দোষে নয়। কোন সাংসারিক কারণেও নয়।'

'তবে কেন তুমি এমন ক'রে চলে এলে?'

'সে কথা বুঝবার সময় তোমার এখনো আসেনি সরমা।'

দুঃসহ ক্রোধে সরমার সমস্ত গা জ্বলে গেছে, 'বেশ তো, আমার সেই বুঝতে পারার সময় পর্যন্তই না হয় তুমি অপেক্ষা করতে।'

'তুমি ধৈর্য হারাচ্ছ সরমা, ফিরে যাও। সংসারে কার জন্য কে অপেক্ষা করতে পারে?'

কিন্তু কারো না কারো জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া সমাজ আর ধর্ম কি শিখিয়েছে সরমাকে? ফিরে এসে সরমা শাশুড়ীর সঙ্গে আর এক

চোট ঝগড়া করেছিল। তার আর কোন অস্ত্র নেই, শুধু জিহ্বা, আর কোন শত্রু নেই, শুধু হেমাঙ্গিনী।

কিন্তু মনে হাজার রাগ থাকলেও চব্বিশ ঘণ্টা আর মানুষ ঝগড়া ক'রে কাটাতে পারে না। বরং পরম শত্রু নিয়েও মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একত্র বসবাস করতে হ'লে জীবনযাত্রার প্রয়োজনে তার সঙ্গেও শত্রুতা ছাড়া আর এক ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে; হেমাঙ্গিনী আর সরমার মধ্যেও তেমন একটা সম্পর্কের সূচনা দেখা যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে দেশে খাদ্যাভাব ঘটল। অভাব যত বাড়তে লাগল, দুজনার মধ্যে ঝগড়াও তত প্রচণ্ড হয়ে উঠল। ঝাড়ের বাঁশ এবং ভিটা ঘাটার গাছপালা বিক্রির টাকার সঙ্গে বাপের দেওয়া দশটাকা ভাতা যোগ ক'রেও যখন ছেলেমেয়েগুলির সামনে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন সরমার দৃষ্টি গেল হেমাঙ্গিনীর ওপর, কী প্রয়োজন আছে এই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির বেঁচে থাকবার? সরমার ছেলেমেয়েদের মুখের গ্রাসে ভাগ বসানো ছাড়া সংসারে বেঁচে থেকে সে আর কোন্ কাজটা করছে? আর যদি বাঁচবার এত সাধই থাকে, অন্য কোথাও গিয়ে বাঁচুক না? হেমাঙ্গিনীর ভগ্নীপতি আছে, বোনপো আছে, সেখানে গিয়ে কাটিয়ে আসুক না দু'মাস?

সরমা একথা পরামর্শচ্ছলে হেমাঙ্গিনীকে দিন দুয়েক বলেওছে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর কোন পা বাড়াবার লক্ষণ দেখা যায়নি। আরও একদিন প্রস্তাবটা তুলতেই হেমাঙ্গিনী ঝাঁজিয়ে উঠলেন, 'আমি যে তোর দু'চক্ষের কাঁটা তাতো অনেক দিন থেকেই জানি। একবেলা যে এক মুঠো হবিষ্যি করি তাও তোর প্রাণে সয় না। কেন যাব অন্য কোথাও? আমি কি তোর খাই না পরি?'

সরমা কিছু বলবার আগে জবাব দিয়েছে কণা, সরমার বছর দশেকের মেয়ে, 'শোন মা, ঠাকুরমার কথা শোন, বলে একমুঠো হবিষ্যি করি। রোজ টুরি মেপে মেপে তুমি যে আধসের ক'রে চাল নাও, তা যেন আমরা আর দেখি না?'

সরমা মুখ টিপে হেসেছে, 'তুই চুপ কর কণি।'

'হ্যাঁ মা, সত্যি। আমি রোজ দেখি।'

হেমাঙ্গিনী কিছুক্ষণ বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে রয়েছেন, তারপর জবাব দিয়েছেন, 'তা তো দেখবিই। সাপের পেটে সাপ ছাড়া আর কি হবে। কথাটা মেয়েকে শিখিয়ে না দিয়ে নিজে বললেই হ'ত।' কণার কথায় সরমা মনে মনে যে একটু লজ্জিত না হয়েছিল তা নয়, কিন্তু হেমাঙ্গিনীর মিথ্যা অপবাদে সেই লজ্জা ক্রোধে রূপান্তরিত হ'তে সময় লাগেনি, 'শিখিয়ে দিয়েছি? বেশ! হাজারবার শেখাবো। তোমার সহ্য হয় থাকো না হয় চলে যাও। ছেলেমেয়েদের কিছু শেখাতে হয় না। ওরা যা দেখে তাই বলে।'

সে-দিনই রাত্রে আবার এই খাওয়া নিয়েই ঝগড়া বাধল। শোয়ার আগে হাঁড়ি কুড়ি ঝেড়ে কোত্থেকে একমুঠো খই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে জল খেতে বসেছেন হেমাঙ্গিনী। সরমা দেখে বলল, 'তবে যে বিকালে বললেন, খই ফুরিয়ে গেছে। খাব খাব বলে ছেলেটা অত কাঁদল, একটা কিছু তার হাতে দিতে পারলাম্ না। দিলেই হোত একমুঠো খই তাকে।'

হেমাঙ্গিনী খইসুদ্ধ বাটিটা ঘরের একধার থেকে আর একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, 'খা, খা, প্রাণের সাধ মিটিয়ে খা।'

ক্ষোভে দুঃখে হেমাঙ্গিনীর ঘুম এলো না। কেবলি মনে হ'তে লাগল —আর কেন। কিসের মায়ায় তিনি এখানে পড়ে আছেন? তাঁর ছেলে সংসার ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও তো সমস্ত বন্ধন খসে পড়েছে। তিনি না বুঝে এই সব নাতি-নাতনীদের আপন মনে ক'রে মিথ্যা মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছেন। অথচ কেউ এরা তাঁর নয়? এই মুহূর্তে সংসারে কারো জন্যই কিছুমাত্র আকর্ষণ হেমাঙ্গিনী অনুভব করলেন না। বরং তাঁর আশংকা হ'তে লাগল এখানে- নিজের বাড়ী-ঘরেই তাঁকে উপোস ক'রে মরতে হবে। যেমন সরমা তেমনি তার ছেলেমেয়ের দল! সাপের পেটে আর কতকগুলি সাপ এসে জন্মেছে।

ভোরে উঠে তিনি পাড়ায় বেরুলেন। সরকারদের বড় গিন্নী তাঁরই সমবয়সী। একই বছরে বউ হ'য়ে এই গ্রামে তাঁরা ঢুকেছিলেন। এ পাড়ায় তাঁকে হেমাঙ্গিনী একমাত্র ব্যথার ব্যথী মনে করেন। আর সবাইকেই তিনি চেনেন। সাক্ষাতে বন্দনা অসাক্ষাতে নিন্দা করতে তাঁর জুড়ি নেই।

হেমাঙ্গিনী কেঁদে বল্লেন, 'আজ দু'দিন ধ'রে আমার সমানে উপবাস যাচ্ছে বিশুর মা। শত্রুরা আমাকে না খাইয়ে খাইয়ে মারবে।'

কলকাতা থেকে বিশু দিন কয়েক আগে ছুটি নিয়ে এসেছিল বাড়ী। সমস্ত শুনে সে বল্ল, 'আমার কথা শুনবেন খুড়ী মা! তাহলে তো একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে।'

হেমাঙ্গিনী বল্লেন, 'শুনব বাবা শুন্‌ব। তুই যা আমাকে কর্‌তে বলিস তাই কর্‌ব।'

বিশু একটু ভেবে বল্ল, 'তাহ'লে আর দেরি নয়। চলুন আপনি আমার সঙ্গে কলকাতায়। সেখানে খিদিরপুর অঞ্চলে আমি যাঁদের কাজ করি তাঁরা এক অনাথ-আশ্রম খুলেছেন। মা-বাপ হারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেখানে খেতে পরতে দেওয়া হয়। তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন খুব ভদ্রঘরের বয়স্কা স্ত্রীলোক ওঁরা খুঁজছিলেন। আপনাকে সেখানে আমি ঠিক ক'রে দেব। খোরাক পোষাক বাদে মাইনেও পাবেন পনের বিশ টাকা। আপনার কোন ইতস্তত করবার কিছু নেই, বেশ সম্মানের কাজ, তাছাড়া আমি তো আছি।'

হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ বললেন, 'তাই নিয়ে চল্ বাবা, এই শত্রুপুরীতে আর নয়।'

তবু যাওয়ার সময় চোখ দিয়ে জল বেরুল হেমাঙ্গিনীর। স্বামী-শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে এই যে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তাকে বেরুতে হ'ল, এর মধ্যে পরাজয়ের অবমাননার কথা তিনি ভুলতে পারলেন

না। পুত্রবধূর সঙ্গে তিনি পেরে উঠলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁকেও সে বাড়ির বের করে ছাড়ল। যাওয়ার সময় তিনি সরমাকে বলে গেলেন, 'এবার মিটেছে তো মনের সাধ? আমার ছেলেকে ভিটা ছাড়া ক'রেছিস আজ আমাকেও করলি। এবার মনের সুখে থাক্ একেশ্বর হয়ে। যা খুসী তাই করতে পারবি, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আকাশে এখনো চন্দ্র সূর্য ওঠে তারাই সাক্ষী থাকবে। যে আশায় আমাকে তাড়ালি সে আশায় যেন ছাই পড়ে, ছাই পড়ে, ছাই পড়ে।'

আজ গাড়ী ধরবার জন্য নৌকায় করে যেতে যেতে হেমাঙ্গিনীর মনে হ'তে লাগল সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হ'য়ে গেছে। কোন আনন্দ নেই, স্বাদ নেই জীবনে।

মাসখানেকের মধ্যে দুর্ভিক্ষ চরম রূপ গ্রহণ করল। চালের মণ ষাট টাকা সত্তর টাকা; তাও সর্বত্র পাওয়া যায় না। ঘরে সোনা রূপা সামান্য যা অবশিষ্ট ছিল তা বিক্রী ক'রে কাল পর্যন্ত চলেছে। থালা ঘটি বাটি কিছু বলতে আর নেই ঘরে। তবু সরমা ভোরে উঠে মাটীর হাঁড়ি কুড়িগুলি নেড়ে চেড়ে দেখছে, মনের ভুলে কোথাও যদি কিছু রেখে থাকে।

এই সময় পোষ্ট অফিসের পিওন এসে হাঁকল 'সরমাবালা দত্তের মণিঅর্ডার আছে। ছেলেমেয়েগুলি কলস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, মা, এসো শিগগির টাকা এসেছে।' পড়ি কি মরি ক'রে মই বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল সরমা। 'বাবা টাকা পাঠিয়েছে বুঝি?'

না, সরমার বাবা নয়, টাকা পাঠিয়েছেন হেমাঙ্গিনী। কুড়ি টাকা মণি অর্ডার ক'রেছেন। টাকাটা সই ক'রে রেখে তাড়াতাড়ি কুপনখানা নিয়ে পড়তে বসল সরমা।

দেশের অবস্থার কথা সব হেমাঙ্গিনী শুনেছেন। অনাথ আশ্রমের একটি ছেলে রোজ তাঁকে খবরের কাগজ প'ড়ে শোনায়। তার মুখ ঠিক সরমার বড় ছেলে খোকনের মত। সরমা আর তার

ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে চোখে ঘুম হয় না হেমাঙ্গিনীর। মাইনে পেয়েই সমস্ত টাকাটা তাদের জন্য তিনি পাঠিয়ে দিলেন। হেমাঙ্গিনীর জন্য ভাবনা নেই। তাঁর ওখানে কোন খরচই লাগে না। তিনি বিশুকে ব'লে আর কয়েক দিনের মধ্যেই আর কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। সরমা যেন ছেলেপুলে নিয়ে সাবধানে থাকে। কোন চিন্তা ভাবনা যেন না করে সরমা। হেমাঙ্গিনী বেঁচে থাকতে সরমার ভয় কিসের ?

হেমাঙ্গিনীর এমন স্নেহ আর সহৃদয়তা সরমার কাছে অপ্রত্যাশিত। এই টাকা কয়টা না পেলে ছেলেপুলে নিয়ে উপোস করা ছাড়া আজ আর সরমার সত্যিই গতি ছিল না। সমস্ত রাত আর সকাল ভাবনায় কাটাবার পর এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল সরমা। তারপর নিরুদ্বেগ স্বস্তির মধ্যে শাশুড়ির লেখা কুপনটা আর একবার পড়ল। পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা লাইনে সরমার চোখ ঢেকে গেল, হেমাঙ্গিনী বেঁচে থাকতে সরমার ভয় কিসের, বুড়ী শাশুড়ী বিদেশে গিয়ে মাত্র কুড়ি টাকার মাইনের চাকরির জোরে ঠিক পুরুষ মানুষের মত, সরমার স্বামী শ্রীপতির মতই তাকে আজ ভরসা দিচ্ছেন হেমাঙ্গিনী বেঁচে থাকতে সরমার ভয় কিসের ? এর আগে শাশুড়ীর অনেক সহজ সরল প্রশ্নের বেশ কড়া কড়া বাঁকা বাঁকা জবাব দিয়েছে সরমা কিন্তু আজকের প্রশ্ন তাকে একেবারে নিরুত্তর ক'রে ছেড়েছে, এর চেয়ে চলে আসুন হেমাঙ্গিনী বাড়ী থাকুন তার নাতি-নাতনী নিয়ে। নির্বিবাদে সব তিনি ভোগ করুন, সরমা আর কিছু চায় না কেবল সেই অনাথ আশ্রমের চাকরিটি চায় ? ফি মাসে এমনি ক'রে হেমাঙ্গিনীর নামে সে টাকা পাঠাবে আর একটি মাত্র লাইন লিখবে কুপনে, সরমা বেঁচে থাকতে হেমাঙ্গিনীর ভয় কিসের।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জৈনুদ্দিন শহরের গলিতে গলিতে সুন্দর মুখ অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল। আনারসের চালান নিয়ে ভিন্ন জেলা থেকে যে যুবক মহাজনটি খালের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়িয়েছে তার ভিতরে ভিতরে রস যে টলমল করছে এ কথা মাত্র ঘণ্টাখানেকের আলাপেই টের পেয়েছে জৈনুদ্দিন। যুবক কাঞ্চন মিঞা এ ভরসাও দিয়েছে যে টাকা-পয়সার জন্য জৈনুদ্দিন যেন না ঘাবড়ায়। হেসে বলেছে, 'সাহেব, কৃপণ লোকে কি আর আনারস খেতে পারে? অনেক ফেলে ছড়িয়ে তবে না রস?'

সুতরাং রস সংগ্রহের ব্যাপারে জৈনুদ্দিন কিছু বিশেষ মনোযোগই দিয়েছে আজ। বেশ উৎসাহই লাগছে। টাকা-পয়সার কথা ছেড়ে দিলেও পরকে এ রসের কেবল জোগান দেওয়াতেও কম সুখ নেই।

গলিতে ঢুকতেই থানার এক সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা। সেপাই মুচকি হেসে বলল, 'কি মিঞা খবর কি? অমন করে কি খুঁজে বেড়াচ্ছ কোন জহরৎ-টহরৎ হারাল নাকি?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'আজ্ঞে বলেছেন ভালো, হেঃ হেঃ হেঃ! জহরৎই খুঁজছি বটে।' সেপাই হাসল, 'কিন্তু জহরৎ পেলেই বা তোমার কি লাভ? দেবে তো অন্যকে। তুমি মিঞা কেবল নারকেলের ছোবড়া ছাড়িয়েই গেলে, ভিতরটা আর ভেঙে দেখলে না। যাই হোক জহরৎ টহরৎ কিছু পেয়ে গেলে গরীবকে একেবারে ভুলো না।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'আজ্ঞে তাই কি পারি? আপনাদের মেহেরবানীতেই তো আছি।'

জৈনুদ্দিনের মনে পড়ল আগে এই সব থানার লোকদের কি রকম ভয়টাই না সে করত। দূর দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে তার বুক কাঁপত,

কারো সঙ্গে রঙ্গ-পরিহাস করা তো দূরের কথা। কিন্তু এই বছর দেড়েকের অভিজ্ঞতায় এদের সঙ্গে ভাব রাখার কৌশলটা সে আয়ত্ত করে ফেলেছে, কোন ভয় আর তার নেই। জেলা শহরের গণ্যমান্য অনেক লোকের সঙ্গে তার গোপন আলাপ, এমন কি দোস্তী পর্যন্ত হয়েছে। সেই সব দিনের কথা জৈনুদ্দিন প্রায় ভুলেই গেছে যখন ছত্রিশ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে এই জেলা শহরের লঙ্গরখানার সামনে এসে তিন দিন মড়ার মত পড়েছিল। মাছের বাজারে এক ভদ্রলোকের পকেট কাটতে গিয়ে পাঁজরের একখানা হাড় যে প্রায় ভেঙ্গে যাওয়ার উদ্যোগ হয়েছিল সে কথাটাও জৈনুদ্দিন তেমন করে মনে রাখতে পারেনি। কদাচিৎ এক আধ সময় ব্যথাটা হয়ত একটু একটু এখনও লাগে কিন্তু আর পাঁচ জনের মত সেই ইতিহাসটা জৈনুদ্দিনেরও আর সব সময় মনে পড়ে না।

জহরৎরা এর আগে শহরের কেবল কয়েকটা জায়গাতেই বাসা বেঁধে থাকত। কিন্তু কিছু কালের মধ্যে তারা প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও গোপনে, কোথাও আধা-আধি, কোথাও পুরোপুরি। দেখতে দেখতে শহরের এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় এসে পড়ল, পছন্দ মত মুখ আর মেলে না। কাঞ্চন মিঞার প্রমোদের সামগ্রী তো নয় যেন নিজের জন্যই কনে খুঁজে বেড়াচ্ছে জৈনুদ্দিন। এত খুঁৎ-খুঁৎ!—এক সময় তার নিজেরই হাসি পেল।

রাস্তার দুপাশের প্রত্যেকটি মুখের ওপর তীক্ষ্ণ চোখ ফেলতে ফেলতে হঠাৎ একখানি মুখে জৈনুদ্দিনের দৃষ্টি একেবারে নিবদ্ধ হয়ে রইল। পলক যেন আর পড়তে চায় না। এ মুখ অত্যধিক সুন্দর নয়, কিন্তু অতিমাত্রায় পরিচিত।

জৈনুদ্দিনকে চিনতে পেরে ফতেমারও হৃৎস্পন্দন যেন মুহূর্তকালের

জন্য বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সপ্রতিভভাবে ফতেমা বেশ শক্ত হ'য়ে দাঁড়াল, যেন জৈনুদ্দিনকে লক্ষ্যই করেনি।

জৈনুদ্দিন একবার ভাবল চলে যায়। কিন্তু চিনে যখন ফেলেছেই পালিয়ে কি লাভ? তাছাড়া ফতেমার সঙ্গে কথা বলবার একটা দুর্দম ইচ্ছা জৈনুদ্দিনকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলল। কিন্তু জৈনুদ্দিন এগিয়ে যেতেই ফতেমা মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করল।

জৈনুদ্দিন পিছন থেকে ডেকে বলল, 'শোন।'

ফতেমা ফিরে তাকাল, কঠিন স্বরে বলল, 'কি ?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'এখানে এলে কবে ? তুমি না শেষে বুড়া আবদুল খাঁর সঙ্গে নিকা বসেছিলে ?'

ফতেমা তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'নিকা তো এক সময় তোমার সঙ্গেও বসেছিলাম মিঞা।'

জৈনুদ্দিন একটু কাল চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'ভিতরে চল কথা আছে।'

ফতেমা রুক্ষ স্বরে বলল, 'না।'

'না কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? ঘরে ঢুকে তোমার জিনিসপত্র লুটে নিয়ে পালাব, না ?'

ফতেমা বলল, 'আর যাওয়ার সময় গলা টিপেও রেখে যেতে পার। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।'

জৈনুদ্দিন খানিকক্ষণ ক্রুর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, বটে! কিন্তু তোমার সাধ্যটাও তো বিবি কম দেখছি না।'

ফতেমা আবার ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল, জৈনুদ্দিন ব্যঙ্গ ক'রে বলল, 'আহা হা বিবি গোসা ক'রে নিজের ক্ষতি করছ কেন, তার চেয়ে আমিই যাচ্ছি', বলে জৈনুদ্দিন এবার সত্যই সরে গেল।

পাশের মেয়েটি বলল, 'ও ফতি, খদ্দেরকে ঝগড়া করে তাড়ালি কেন ?'

ফতেমা বলল, 'তাড়াব না? ও যে এককালে আমার সোয়ামী ছিল রে!'

'তাই না কি? তা হলে তো আরো জমতো ভালো।'

ফতেমা অদ্ভুত একটু হাসল, 'হাঁ তাতো জমতই।'

জমাবার চেষ্টা আরম্ভ ক'রেছিল জৈনুদ্দিন আজ নয়, আরো বছর সাতেক আগে। তার দাদা মৈনুদ্দিন ফতেমাকে বিয়ে ক'রে আনার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর জৈনুদ্দিনের চোখ পড়েছিল। মেটে কলসী কাঁখে ঘাট থেকে যখন ফতেমা জল নিয়ে ফিরত সেই চোখ তাকে অনুসরণ করতে করতে আসত। ঢেঁকিতে যখন ধান ভানত ফতেমা, বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেই চোখ তার চঞ্চল ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে থাকত। কেবল নীরব দৃষ্টিতেই নয়, আড়ালে আবডালে পেয়ে ফতেমার কাছে ভাষা দিয়েও জৈনুদ্দিন নিজের সেই দৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে।

'ভাবী সাব, আমার চোখে ভারী সুন্দর লাগে তোমাকে।'

ফতেমা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, 'খবরটা তোমার মিঞা ভাইকে একবার দিয়ে দেখব।'

'ভাবী সাব, তোমার ভিতরটা কি কাঠ?'

'তোমার মিঞা ভাইকেই জিজ্ঞেস কোরো।'

কিন্তু মিঞা ভাইর দোহাই খুব বেশী দিন চলল না। পাঁচ বছরের মাথায় নিমুনিয়ায় মৈনুদ্দিনের মৃত্যু হ'ল। মাসখানেক যেতে না যেতেই ফতেমার বাপ ইব্রাহিম কারিগর নিকা দেওয়ার জন্য সম্বন্ধ দেখছে, জৈনুদ্দিন গিয়ে বলল, 'ভাবীসাব, মিঞা ভাই তো ফাঁকি দিয়েই গেল। খোদার ইচ্ছার ওপর তো মানুষের আর জোর থাকে না! জোর জুলুম মানুষের আপন জনের ওপরই চলে।'

কথার ভাব বুঝতে পেরে ফতেমা আরক্ত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে

রইল, তার পর বলল, নিকা করবার আমার আর কোথাও ইচ্ছা নেই রাঙা মিঞা। কিন্তু তুমি যদি ভরসা দাও এই বাড়ীতেই আমি থাকতে পারি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তোমার বাড়ী তোমার ঘর, এ ছেড়ে তুমি যাবে কোথায়। কিন্তু পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে পারে। এই জন্যেই দু'দশ টাকা ব্যয় ক'রে কেবল মোল্লা মুন্সীদের মুখটা বন্ধ ক'রে রাখা!'

ফতেমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবল। কেবল ঠাট্টা ইয়াকি নয় সাময়িক ইচ্ছাপূরণ নয়। জৈনুদ্দিন সঙ্গতভাবে নিজে যেচে তাকে বিয়ে করতে চাইছে।

এই অনুরাগকে সন্দেহ করা যায় না, এই ভালোবাসার ওপর সারা-জীবন নির্ভর ক'রে থাকতে সাধ যায়। এমন আপনজন ক'জন মেলে সংসারে?

ফতেমা বলল, 'কিন্তু তোমার নিজেরও তো পরিবার আছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে রাঙা মিঞা।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'থাকলেই বা। আমার বাজানের কয় বিবি ছিল জানো? চার জন। পুরোপুরি একহালি। শেষ রাতে উঠে আমার চার মা তাঁতখোলায় গিয়ে তানা কারাতে আরম্ভ করত। খট্‌খট্ শব্দে আমার ঘুম যেত ভেঙে। বাজান হুঁকো টানতে টানতে বিবিজানদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতেন। আজকালও এক এক রাত্রে খোয়াবের মধ্যে সেই তানা কারবার শব্দ শুনে আমি বিছানার ওপর উঠে বসি। তুমি যদি মেহেরবানী কর বরুবিবি, তোমাদের নিয়ে আমি আগের মত সেই রকম ক'রে তাঁত খুলব। মেহের কারিগরের ছেলে আমি, আমার কি বাড়ী বাড়ী গিয়ে এমন জন-মজুরী পোষায়?'

ফতেমা জৈনুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু ভারী যে সরম ক'রে মিঞা।'

জৈনুদ্দিন হেসে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বিবিজান তুমি তো জানো না এই সরমের সময় তোমাকে আরো বেশী খাপসুরৎ ঠেকে।'

জৈনুদ্দিন যেন মত্ত হ'য়ে উঠল। নিত্য নতুন তার আদর জানাবার কায়দা, এত কায়দা মৈনুদ্দিনের কোন দিন মাথায় আসত না। নিত্য নতুন নামে ডাকে জৈনুদ্দিন, নিত্য নতুন ভাষায় ভালোবাসা জানায়। এত কথা কোন দিন মুখচোরা মৈনুদ্দিনের মুখে আসত না।

পাশের ঘরে সাকিনা ছেলে নিয়ে ছট্‌ফট্ করত। ফতেমাই শেষে দয়া ক'রে বলত, 'হয়েছে, হয়েছে, এবার ছোট বিবির ঘরে যাও দেখি একটু।'

কিন্তু বছরখানেক যেতে না যেতেই স্রোতের মুখ গেল ঘুরে। এক ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে জৈনুদ্দিন সর্বস্বান্ত হ'ল। ভিটে মাটি পড়ল বন্ধক। যুদ্ধের দরুণ গৃহস্থালীর খরচা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। তাঁত আর খোলা হ'ল না তার বদলে দুই বউকে দুই ঢেঁকি পেতে দিল জৈনুদ্দিন। ফি হাটে ধান কিনে আনে, দুই বউকে পাল্লা দিয়ে চাল ভেনে দিতে হয়। সেই চাল বিক্রির পয়সায় চলে সংসার। ক্রমে দেখা গেল এদিক থেকে বরুবিবি কেবল পটের বিবি কোন কাজের নয়। তার সময়ও লাগে বেশি, কাঁড়া চালের খুদও বেশি থাকে। সাকিনা তার চেয়ে অনেক শক্ত অনেক খাটুয়ে। ফলে সাকিনার ওপরই দরদটা বেশি গিয়ে পড়ে জৈনুদ্দিনের। তার জন্য মাজন আসে, তার ছেলের জন্য আসে আখ আর বাতাসা। দুধেল গাইকে খোল জাব বেশী করে খাওয়াতে হয়। ফতেমা ছটফট্ করে কিন্তু সাকিনা কিছুমাত্র ভাগ দেয় না। স্বামীর ভাগ দিয়েছে আবার আরো?

তারপর এলো সেই দেশ-জোড়া দুর্ভিক্ষ। হাটে বাজারে ধান মিলে না, ফতেমা আর সাকিনা দুজনেই বেকার। তবু সাকিনা আর তার ছেলে-মেয়ের ওপরই টান বেশি জৈনুদ্দিনের। শত হলেও সাকিনা তার বিয়ে করা বৌ, বজলু তার নিজের ছেলে।

বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। চেয়ে চিন্তে যেখান থেকে যা পায় সব সাকিনা আর তার ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়ায় জৈনুদ্দিন। শুকিয়ে শুকিয়ে ফতেমা অস্থিসার হয়, নড়ে বসবার শক্তি থাকে না; তবু জৈনুদ্দিনের ভ্রূক্ষেপ নেই।

এর পর ফতেমা আর সরম রাখতে পারে না। বলে, 'একি তোমার ব্যবহার মিঞা? পায়ে ধরে চৌদ্দবার ক'রে সেধে নিকা করেছিলে মনে নেই?'

জৈনুদ্দিন জবাব দেয়, 'না নেই। কিন্তু এখন পায়ে ধরেই বলছি রেহাই দে রেহাই দে আমাকে, মিঞা ভাইকে খেয়েছিস, আমাকে আর খাসনে। গাঁয়ে আরো তো মুসলমান আছে তার ঘরে যা।'

দিনকয়েক উপবাসের পর ফতেমা সোজা চলে এল বুড়ো আবদুল খাঁর বাড়ি। জৈনুদ্দিন কোন বাধা তো দিলই না। বরং খুসি হ'ল।

আবদুল খাঁ তার দিকে বার কয়েক তাকিয়ে বলল, 'নিকা তো তোমাকে করবই বিবি। গণ্ডা কয়েক ছেলে-মেয়ে শুদ্ধ দু'জন বিবিকে যখন এই বাজারে পুষতে পারছি, তোমাকেও পারব। কিন্তু তার আগে চল একবার শহর থেকে ঘুরে আসি। খাসি আর মুরগীর চালান নিয়ে যেতে হবে, একা একা যেতে ভালো লাগছে না।'

আবদুল খাঁর চালানের নৌকায় উঠে বসবার সময় ফতেমার কানে গেল কলেরায় বজলু আর সাকিনা দু'জনেই শেষ হ'য়ে গেছে।

ফতেমা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়েই প্রার্থনা করল, 'হে খোদাতাল্লা, জৈনুদ্দিনও যেন আজ রাতে গোরে যায়।'

খানিক ঘোরাঘুরির পর জৈনুদ্দিন আবার এসে উপস্থিত হ'ল ফতেমা অবাক হয়ে বলল, 'তোমার কি কোন সরম নেই মিঞা?

জৈনুদ্দিন বলল, 'সরমের কথা যাক। তোমার সাথে একটা কাজের কথা বলতে এসেছি বরুবিবি।'

'কাজের কথা? আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ তোমার সঙ্গেই। লাভ তোমারই! আমার আর কি।'

জৈনুদ্দিন নাছোড়বান্দা। অগত্যা তাকে একটু আড়ালে এনে ফতেমা তার প্রস্তাবটা শুনল এবং শুনে প্রথমটা থ' খেয়ে গেল। সে ভেবেছিল কাকুতি মিনতি ক'রে জৈনুদ্দিন নিজেই আসতে চাইবে। কিন্তু অন্যের জন্য যে সুপারিশ করবে জৈনুদ্দিন তা সে ধারণাই করতে পারে নি। ভিতরে ভিতরে এমন পিশাচ হয়েছে জৈনু মিঞা এমন পাকাপোক্ত শয়তান? কিন্তু সেই যদি পারে ফতেমাই বা কেন পারবে না, বিশেষত লোকটিকে যখন শাঁসালো বলেই শোনা যাচ্ছে। লাভ ছেড়ে দিয়ে ফল কি?

কাঞ্চন মিঞা দু'তিন দিন যাতায়াত করে। তারপর আসে থানার নুরুদ্দিন সাহেব, তারপর কাছারির কল্যাণ গাঙ্গুলি।

না, পিশাচ হলেও জৈনুদ্দিন একেবারে ডাহা চালবাজ নয়। তার আনা লোকগুলির সত্যি পয়সা আছে আর তারা পয়সা ব্যয় করতেও জানে।

ইতিমধ্যে বেশ একটু নতুন ধরনের অন্তরঙ্গতা জন্মেছে জৈনুদ্দিন আর ফতেমার মধ্যে। মাঝে মাঝে ডিমটা, মাছটা আনাজটা হাতে ক'রে আনে জৈনুদ্দিন। ফতেমা গরমের দিনে সরবৎ করে দেয়, ঠাণ্ডার দিনে চা খাওয়ায়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে জৈনুদ্দিন বলে, 'গাঙ্গুলি ছোঁড়াটা কিন্তু কেমন যেন একটু বোকা বোকা নয়?'

ফতেমা হেসে ওঠে, 'ছাই জানো তুমি। আসলে বজ্জাতের ধাড়ী। এখানে এসে অনেকেই অমন ন্যাকা ন্যাকা ভাব করে। কিন্তু একটু টিপে দেখলেই আমরা সব টের পাই।'

জৈনুদ্দিন হেসে মাথা নাড়ে, 'তা ঠিক, তোমাদের ফাঁকি দেওয়ার জো নেই।'

ফতেমা আবার বলে, 'তোমাদের নুরুদ্দিন কিন্তু ভারি ধার্মিক। বলে ফতেমা আমার একজন গুরুজনের নাম। আমি বলি তাতে

কি, আমার আরো হাল্কা হাল্কা দু'তিনটে নাম আছে আতরজান, দিলজান যা খুসি বলে ডাকতে পার।' বলে ফতেমা মুখ টিপে হেসে জৈনুদ্দিনের দিকে তাকায়। যখন নিত্য নতুন নামে ডাকার বাতিক ছিল জৈনুদ্দিনের এ-সব সেই তখনকার নাম। জৈনুদ্দিন এবার গম্ভীর ভাবে বলে, 'আচ্ছা এখন উঠি বরু বিবি, বেশি সময় নিয়ে তোমার ক্ষতি ক'রে লাভ কি।'

ফতেমা বলে, 'এত তাড়াতাড়ি কেন। গোসা হল নাকি মিঞার।'

জৈনুদ্দিন হেসে ওঠে, 'ক্ষেপেছ। গোসা হ'লে দু'জনেরই ক্ষতি।'

ফতেমার বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। কেবল ক্ষতির ভয়েই কি জৈনুদ্দিন কোন দিন গোসা করে না, অভিমান করে না, হিংসা করে না? ক্ষতির ভয় কি মানুষকে এমন পাথর ক'রে ফেলে?

দিনকয়েক আগে ফতেমা সেদিন ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, 'যা'ই বল, আজকাল তুমি কিন্তু একেবারে পয়গম্বর হ'য়ে গেছ মিঞা। তাবিজ কবচ নিয়েছ না কি হাসেম ফকিরের কাছে?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে জৈনুদ্দিন বলেছিল, 'ময়রায় কি আর সন্দেশ খায় বিবি?'

ফতেমা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছিল, 'তা ঠিক, সন্দেশ-বেচা পয়সা খেলে তো আর জাত যায় না।'

জৈনুদ্দিন এমন পাথর হ'ল কি ক'রে। তার চোখে রঙ নেই, হাসিতে রঙ নেই—পরিহাস ওপর ওপর যতই করুক জৈনুদ্দিন কোন দিন তাকে ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখে না, অথচ সবাই বলে ফতেমা আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী হয়েছে। কল্যাণ বলে, তেমন করে সেজেগুজে বেরুলে তাকে না কি ঠিক কলেজে-পড়া মেয়েদের মত দেখায়। কিন্তু জৈনুদ্দিন তাকে ছোঁয় না। জৈনুদ্দিন তাকে ঘৃণা করে। এতখানি ঘৃণা করবার অধিকার কোথায় পেল সে, জৈনুদ্দিন কি তার চেয়ে কম পাপী? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজের অন্তরকেই ফতেমা জর্জর করে তোলে, ক্ষুব্ধ হৃদয় কিছুতেই শান্ত হ'তে চায় না।

সেদিন আবার আর একজন শাঁসালো লোকের সন্ধান আনল জৈনুদ্দিন। বলল, 'ভালো ক'রে সেজেগুজে থেকো বরু বিবি। লোকটি কিন্তু ভারী সৌখীন।'

ফতেমা ম্লান মুখে বলল, 'কিন্তু আমার যে ভারী মাথা ধরেছে। জ্বরই যেন এসে পড়ে পড়ে।'

জৈনুদ্দিন ব্যস্ত হ'য়ে বলল, 'তাই না কি? তবে আজ থাক্, চুপ-চাপ শুয়ে থাক বিছানায়।'

কথার মধ্যে পুরানো আন্তরিকতার সুর যেন আবার ফিরে এসেছে।

ফতেমা বলল, 'কিন্তু তুমি তো কথা দিয়ে এসেছ, কথার খেলাপ করলে ক্ষতি হবে না? তার চেয়ে নিয়েই এসো।'

জৈনুদ্দিন ধমক দিয়ে বলল 'যা বলছি তাই কর। শুয়ে থাকো চুপ-চাপ। পয়সার লোভ বড় বেশি তোমাদের।'

ফতেমা মনে মনে খুশী হ'ল, কিন্তু খোঁচা দিতে ছাড়ল না।

'আর তোমাদেরই বুঝি কম?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তর্ক না ক'রে একটু শুয়ে থাক দেখি, মাথা কি দু'দিকেই ধরেছে, খুব বেশী।

ফতেমা শুয়ে পড়ে বলল, 'খুব। যেন ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে।'

'তা হ'লে এক কাজ কর। জলপটি দিয়ে রাখো মাথায়।'

ফতেমা কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল। জলপটির স্মৃতি তাকে আরেক যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

সেদিনও দারুণ মাথা ধরেছিল ফতেমার। ছট্‌ফট্ করছিল যন্ত্রণায়। হাট থেকে এসে শুনতে পেয়ে হাত ধোয়া নেই, জৈনুদ্দিন নিজে এসে তাড়াতাড়ি ভিজে নেকড়ার পটি বেঁধে দিল ফতেমার কপালে, তার পর শিয়রে বসে শুরু করল পাখা দিয়ে বাতাস করতে। সাকিনা ঠাট্টার ছলে অনেক বাঁকা বাঁকা কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল। বলল, 'জলজ্যান্ত এমন লম্বা চওড়া পুরুষ মানুষটাকে ভেড়া ক'রে ফেললে কি ক'রে বরুবিবি, ধন্য তোমার যাদুর মহিমা।'

সেই যাদু এমন ক'রে ভেঙে গেল কি ক'রে? কেবল কি ফতেমাই তা ভেঙেছে?

জৈনুদ্দিন বলল, 'কি, শুয়েই আছ যে। যা বলছি তাই কর, নেকড়া ভিজিয়ে জলপটি দাও', ব'লে জৈনুদ্দিন আবার বিড়ি টানতে লাগল।

ফতেমা হঠাৎ একেবারে চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়েছে হয়েছে। অত সোহাগে আর দরকার নেই আমার। ভারী দরদ দেখাতে এসেছ। দরদ যে কিসের জন্য তা কি আর বুঝি না? ভয় নেই মাথা-ধরায়, মরে যাব না, কালই উঠতে পারব। কালই আনতে পারবে তোমার লোক।'

জৈনুদ্দিন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এত রাত্রেও শহর ভরে বেশ লোক-জন চলাচল করছে। ক্রমেই বসতি বাড়ছে। দোকানে দোকানে চলছে বেচা কেনা। জনকয়েক অল্পবয়সী মেয়ে-পুরুষ সেজেগুজে গাঁ-ঘেঁষাঘেঁষি করে চ'লছে। তাদের হাসির শব্দ অনেকক্ষণ ধরে কানে লেগে রইল জৈনুদ্দিনের, চুলের আর শাড়ির গন্ধ বাতাসে ভেসে রইল বহুক্ষণ ধরে। সামনের বটগাছের তলাতেই ছিল লঙ্গরখানা। আর তার সম্মুখেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল জৈনুদ্দিন, ফৈজু আর কেষ্ট মণ্ডল। ফৈজু আর কেষ্ট আর ওঠেনি। কিন্তু কে আর মনে রেখেছে তাদের কথা। ফৈজুর বিবি নাকি আবার নিকা বসেছে। তার ছেলে-মেয়েও হয়েছে এর মধ্যে। গাঁয়ে আবার লোকজন ফিরে গিয়েছে। ধান চাল আবার পাওয়া যাচ্ছে। দৈনিক মজুরির হার নাকি গাঁয়েও অনেক বেড়ে গিয়েছে। দেড় টাকার কমে কেউ আর জন খাটে না। শহরে বসে বসেই সব খবর জৈনুদ্দিন পায়। সব খবরই তার কাছে এসে পৌঁছায়।

পরদিন বিকালের দিকে জৈনুদ্দিন আবার গেল ফতেমার কাছে। ফতেমা তখন সাজসজ্জা কেবল শুরু করেছে।

জৈনুদ্দিন বলল, 'গোসা ভেঙেছে বিবি সাহেব?'

ফতেমা বলল, 'না ভাঙলে তো দু'জনেরই ক্ষতি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'তা ঠিক, কিন্তু সাজ-গোজটা আজ একটু ভালো রকম-হয় যেন। লোকটি কিন্তু ভারী সৌখীন। কোন খুঁত থাকে না যেন কোথাও।'

ফতেমা হেসে বলল, 'আচ্ছা, সে আর তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না।'

জৈনুদ্দিন পকেট থেকে একটা শিশি বার করল আর বোঁটাওয়ালা দুটো লাল গোলাপ।

ফতেমা অবাক হ'য়ে বলল, 'ও আবার কি।'

জৈনুদ্দিন বলল, 'গোলাপ দু'টো খোঁপায় গুঁজে নিয়ো। বেশ চমৎকার মানাবে। আর গন্ধটা একটু ছিটিয়ে নিও কাপড়-চোপড়ে। বেশ খোসবয় আছে। লোকটি ভারী সৌখীন কি না।'

ফতেমা হেসে বলল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা। আজ একেবারে ডানাকাটা পরী হয়ে থাকব। কিছু ভেব না।'

জৈনুদ্দিন আবার ফিরে গেল।

খানিক বাদে গোল হ'য়ে চাঁদ উঠল আকাশে। কিছুক্ষণ জৈনুদ্দিন শহরের এ-পথে ও-পথে ঘুরে বেড়াল। এক বাড়ি থেকে চমৎকার রান্নার গন্ধ বেরুচ্ছে, শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের কোলাহল, একটা জানালার ধারে স্বামী-স্ত্রীতে ফিস্ ফিস্ করে কি আলাপ করছে। তাদের দিকে চোখ পড়তেই জৈনুদ্দিন চোখ ফিরিয়ে নিল।

সন্ধ্যার খানিক পরেই জৈনুদ্দিনকে ফিরে আসতে দেখে ফতেমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও মা, এত সকাল সকাল যে? এই না বলেছিলে রাত হবে? কই, তোমার সেই সৌখীন লোক কোথায়?'

জৈনুদ্দিন মুহূর্ত কাল মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফতেমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার নির্দেশ মত ফতেমা আজ ভারী সুন্দর করে সেজেছে। খোঁপায়

গুঁজেছে তারই দেওয়া গোলাপ, শাড়িতে ছিটিয়েছে তারই আনা সুগন্ধি। আজকের বেশে ভারী অপরূপ মানিয়েছে ফতেমাকে। মনে পড়ল না এ সজ্জা কার জন্য।

জৈনুদ্দিন বলল, 'সে আছে একটু আড়ালে। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে নি চল।'

ফতেমা দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে অবাক হয়ে দেখল, তার পাতা বিছানার এক কোণে জৈনুদ্দিন বসে পড়েছে। সাধারণত এ ভাবে জৈনুদ্দিন বসে না।

ফতেমা বলল, 'কি কথা?'

জৈনুদ্দিন বলল, 'শোনই।'

ফতেমা আরও একটু কাছে সরে এসে বসল।

জৈনুদ্দিন ব্যাগ খুলে নতুন একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে ফতেমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে হাতখানা নিজের মুঠির ভিতর চেপে ধরে বলল, 'সে যদি আজ নাই আসে, তোমার কি খুব মন পোড়বে বরুবিবি?'

সঙ্গে সঙ্গে ফতেমাকে জৈনুদ্দিন নিজের দিকে আরও একটু আকর্ষণ করল। ফতেমা একবার জৈনুদ্দিনের দিকে তাকালো, তারপর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মৃদু হেসে নোটখানা ফের জৈনুদ্দিনের পকেটেই গুঁজে দিল।

জৈনুদ্দিন একটু ক্ষুব্ধ হ'য়ে বলল, 'কম হ'ল না কি? আরো চাই তোমার?'

ফতেমা অপূর্ব মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাই না? খরচ কত তার খেয়াল আছে মিঞার? এত কাণ্ডের পর মোল্লা-মুনসীদের মুখ কি আর দু'-পাঁচ টাকায় বন্ধ হবে ভেবেছ?'

ফেরিওয়ালা

'চাই ছিটের কাপড়, সস্তায় সায়া, সেমিজ, ব্লাউসের কাপড়....'

সদর রাস্তা থেকে ফেরিওয়ালা সহরতলীর সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুই দিকে সারে সারে বাড়ি। ছাদে, রেলিঙে নানা রঙের শাড়ি শুকাচ্ছে, স্তব্ধ দুপুর। পুরুষেরা কাজে বেরিয়েছে। মেয়েরা রান্নাঘরের কাজ মিটিয়ে কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াবার সুযোগে নিজেরাও ঘুমিয়ে নিচ্ছে একটু, মিষ্টি মোলায়েম সুরে ঘুম-ভাঙানো ডাক দিতে দিতে ফেরিওয়ালা এগিয়ে চলল, 'চাই সস্তায়...'

ডান দিকের পুরোন জীর্ণ পাটকেলে রঙের একতলা বাড়িখানার একটা জানলা খুলে গেল, 'এই ফেরিওয়ালা, শোন। কি দিচ্ছ সস্তায় ?'

বাড়িটা ছাড়িয়ে এসেছিল ফেরিওয়ালা, ফিরে গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়ায়—'ছিটের কাপড়—সায়া সেমিজ ব্লাউসের...'

'আরে প্রফুল্লদা না ?'

প্রফুল্লও কিছুক্ষণ থেমে রইল, তার পর বলল, 'মল্লিকা তুমি! তোমরা এদিকে থাকো না কি ? কত দিন আছ এখানে ?'

মল্লিকা জবাব দিল, 'অনেক দিন। এই ফাল্গুনে দু'বছর হোল। কিন্তু তোমাকে তো এর আগে—। কিন্তু তোমার দোকানের কি হোল। তোমার দোকান ছিল না বউবাজারের ওদিকে ? তা গেল কোথায় ?'

প্রফুল্ল ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। অদ্ভুত একটু হেসে প্রফুল্ল জবাব দিল, 'যাবে আবার কোথায়। দেখতেই তো পাচ্ছ, কাঁধে উঠেছে।'

কথাটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ফেলে মল্লিকাও হঠাৎ লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, এবার মুখ টিপে হেসে বলল, 'উঠেছে বেশ হয়েছে। না হলে কি আর দেখা হোত। এসো, ভিতরে এসো।'

প্রফুল্ল বলল, 'ভিতরে গিয়ে কি হবে ?'

মল্লিকা বলল, 'আর লজ্জা করতে হবে না, এসো। ভিতরে এসে জিনিষ বেচা-কেনা হবে। মা আছে ভিতরে। এসো ভয় নেই।'

মল্লিকা আবার একটু ঠোঁট টিপে হাসল। প্রফুল্ল একটু হেসে তাকিয়ে রইল সেই চাপা পাতলা ঠোঁটের দিকে। আশ্চর্য, হাসলে এখনো ভারি সুন্দর দেখায় মল্লিকাকে। কালো-পেড়ে একখানা আধ-ময়লা শাড়ি মল্লিকার পরনে। কাঁধের কাছে একটু ছিঁড়েও গেছে। ব্লাউসটা আরো পুরনো। হাতে লাল রঙের দু'গাছি প্লাষ্টিকের বালা। গায়ের আর কোথাও কোন গয়না নেই। গলা কান সব খালি। প্রফুল্লর বুঝতে বাকী রইল না আগেকার সেই সামান্য সচ্ছলতাটুকুও আর নেই মল্লিকাদের। ওরা আরো অভাবে পড়েছে। কিন্তু আর একটি অভাব প্রফুল্লের কাছে ভারি সদ্ভাব-ব্যঞ্জক বলে মনে হোল। সীঁথিতে এখনো সিঁদুর ওঠেনি মল্লিকার। ঘন চুলের মাঝখানে সরু রেখাটুকু এখনো সাদা। মল্লিকা আজও কুমারী।

'দাঁড়িয়েই থাকবে তা হ'লে ?' অভিমানে আরও মিষ্টি শোনাল মল্লিকার গলা। ঠিক পনের-ষোল বছর বয়সে তখন যেমন শোনাত। তার পর আরও সাত বছর কেটেছে। সেই ভরাট মুখ আর নেই মল্লিকার। গাল দু'টোয় একটু ভাঙন ধরেছে। আগের চেয়ে আরো এক-পোঁচ ময়লা হয়েছে রঙ। কিন্তু গলার আওয়াজটুকু যেন ঠিক তেমনি মিঠে আছে বলে মনে হোল প্রফুল্লের।

অন্যান্য জায়গায় থেমে এমন ভিতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ এলে তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে প্রফুল্ল, কিন্তু আজ যেন সঙ্কোচ কাটতে চায় না। ছিটের কাপড়, সাদা লংক্লথ, গোলাপী, আর চাঁপা ফুলের রঙের পপলিনের থান ক'খানা যেন পাথরের মত ভারি মনে হোল প্রফুল্লের। এই বেশে কি ভিতরে যাওয়া যায় ?

ছোট মামীর জেঠতুতো ভাইয়ের মেয়ে। সেদিক থেকে কুটুম্বিতা দূর-সম্পর্কের। কিন্তু সাত-আট বছর আগে সবটুকু দূরত্বই প্রায়

ঘুচবার জো হয়েছিল। নিঃসন্তান বিধবা পিসীর বাড়ীতে মাঝে-মাঝে মল্লিকা বেড়াতে আসত। কখনো কখনো থাকতও দু'-এক মাস। আর মল্লিকা এসেছে খবর পেয়েই প্রফুল্ল ছুটত মামা বাড়ীতে। পাশাপাশি গ্রাম। ছুটেই যাওয়া যেত। কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি এসে শান্ত শিষ্ট গম্ভীর মুখে হাজির হোত প্রফুল্ল। পায়ের ধূলো নিত ছোট মামীর। ক্ষেত-খামার সংক্রান্ত বৈষয়িক কথা-বার্তা বলত তাঁর সঙ্গে, যেন সেই জন্যই এসেছে। মল্লিকা বলে তাঁর কোন ভাইঝিকে যেন প্রফুল্ল চেনে না, তার সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্যও যেন নেই। ছোট মামী সবই বুঝতেন। কিন্তু বুঝেও বুঝতে চাইতেন না, ভারি কড়া ছিলেন এ সব বিষয়ে। তাঁর চোখের পাহারা এড়িয়ে মল্লিকার সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ প্রফুল্ল কমই পেত। তবু রাধাগঞ্জের মনোহারী দোকানের এক বাক্স সাবান, চিরুণী, স্নো-পাউডারের কৌটো মাঝে মাঝে মল্লিকার হাতে গিয়ে পৌছত। কখনো বা শুধু ছোট-ছোট চিঠির টুকরো আর মামা-বাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রফুল্লের সার্টের ঝুল পকেট থেকে বেরুত ফুল-তোলা রুমাল কি বালিসের ঢাকনি।

মামীমা বাইরে যত কড়াই হন, ভিতরে ভিতরে মনটা একটু নরমই ছিল তাঁর। আকারে-ইঙ্গিতে প্রফুল্লের কথাটা পেড়েও ছিলেন জেঠতুতো ভাইয়ের কাছে। কিন্তু মল্লিকার মা-বাবা মাথা পাতেননি। মল্লিকার আরো দুই আইবুড়ো দিদি ছিল তখন। তা ছাড়া তাঁদের নজরও উঁচু ছিল। থার্ড ক্লাশ পর্যন্ত পড়া মফঃস্বল সহরের পঁচিশ টাকা মাইনের মনোহারী দোকানের কর্মচারী প্রফুল্ল কর তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেক নিচে পড়ে ছিল।

কিন্তু সেদিন আর নেই। তার পর সাত বছর কেটেছে। অনেকগুলি দিন হয় সাত বছরে। ততক্ষণে মল্লিকার মা স্নেহলতাও এসে দাঁড়িয়েছেন জানলায়, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস মল্লী ?'

মল্লিকা জানালার পাশ থেকে সরে যেতে যেতে বলল, 'চাঁদ কান্দার

সোনা পিসীমার ভাগ্নে। ডিঙামানিকের প্রফুল্ল—প্রফুল্লদা। লজ্জায় আসতে পারছে না ভিতরে।'

স্নেহলতা লক্ষ্য করে বললেন, 'ও মা, তাই তো, সেই প্রফুল্লই তো, তা লজ্জা কিসের! এসো, এসো, পুরুষ ছেলের আবার লজ্জা কিসের বাবা! যা তো মল্লিকা, সদরটা খুলে দিয়ে আয়। ও-পাশ দিয়ে ঘুরে এসো প্রফুল্ল।

মল্লিকার মাকেও মামা-বাড়ীতে দেখেছে প্রফুল্ল। সেই মোটা-মোটা চেহারা এখন হাড়-সার হয়েছে। মল্লিকার মা'রও শাঁখা-সিঁদূর ছাড়া আর কোন ভূষণ নেই। পরনে পুরুষের পুরনো চুল-পেড়ে ধুতি।

সঙ্কোচটা অনেকখানি কমে গেল প্রফুল্লর। ঘুরে এসে দাঁড়াল সদর দরজার কাছে। দোর ততক্ষণ খুলে গেছে। মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে মল্লিকা।

মুহূর্তকাল চুপ-চাপ কাটল। মল্লিকাও এবার কাছ থেকে আরো ভালো করে দেখে নিল প্রফুল্লকে। গায়ে টুইলের সাদা সার্ট, পরনে ফর্সা কোচানো ধুতি, পায়ে ষ্ট্রাইপের স্যাণ্ডাল। বেশে-বাসে এখনো বেশ সৌখীনতা আছে প্রফুল্লর। সাতাশ—আঠাশ বছরের যুবকের স্বাস্থ্য। ঝড়-ঝাপটার পরেও বেশ শক্ত আছে। রঙটা যেন আরো ফর্সা হয়েছে। ব্যাক-ব্রাস করা ঘন কালো চুলগুলি আগের চেয়ে আরো সুন্দর হয়েছে। কেবল কাঁধে কাপড়ের থানগুলি বে-মানান। তা ওগুলি নামিয়ে রাখতে কতক্ষণ।

মল্লিকা বলল, 'এসো।'

প্রফুল্ল বলল, 'তোমার বাবা বুঝি অফিসে বেরিয়েছেন?'

মল্লিকা একটু থামল, তারপর বলল, 'বেরিয়েছেন, কিন্তু অফিসে নয়।

'তবে কোথায়?'

'তুমি বুঝি কিচ্ছু জান না? জানবেই বা কি করে। পিসীমা মারা যাওয়ার পরে তো আর কোন খোঁজ খবর নেই। কি সব

গোলমালে বাবার সেই অফিসের চাকরি গেছে। অনেক দিন বসে ছিলেন। বছর তিনেক হোল গাড়িতে গাড়িতে হোড় কোম্পানীর দাঁতের মাজন আর বাতের মালিসের ক্যানভাস করেন।'

নিজেদের পরিবারের এতগুলি কথা ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে ফেলে মল্লিকা যেন অপ্রস্তুত হোল। তারপর প্রফুল্লকে একটু খোঁচা দিয়ে বলল, 'কিন্তু এতদিন পরে দেখা? মা-বাবার খোঁজ খবর নেওয়া ছাড়া আর বুঝি তোমার কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই?'

প্রফুল্ল একটু হাসল, 'আছে বই কি, আরো কিছু জিজ্ঞেস করবার আছে বলেই তো ওসব কথা আগে কয়ে নিচ্ছি। জান তো আমাদের ফেরিওয়ালাদের স্বভাব। কাঁচা বয়সের ঝি-বউদের নিয়ে কারবার, তাই আগে থেকেই আট-ঘাট সব জেনে রাখতে হয়। কোথায় বাবা-মা, কোথায় শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী—'

মল্লিকার মুখের দিকে চেয়ে প্রফুল্ল আবার একটু হাসল। নিজের ব্যবসা নিয়ে এর আগে এমন সুরে, এমন ভঙ্গিতে প্রফুল্ল কোন দিন পরিহাস করতে পারেনি। কাঁধের কাপড়ের থানগুলির ভার যেন আর নেই। পপলিন, মলমলের রঙ যেন কেবল থানেই নয়, প্রফুল্লর সমস্ত মনে—সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। সে রঙের ছোপ লেগেছে মল্লিকার মুখে।

আরক্ত মুখে একটু কাল চুপ করে থেকে ফের মুখ খুলল মল্লিকা। কৃত্রিম সংশয়ে অভিমানে কুঁচকালো যুগল ভ্রূ, বলল, 'তাই বল। এত কাজ থাকতে বেছে-বেছে তাই বুঝি এই চাকরি নিয়েছ? এই স্বভাব হয়েছে বুঝি আজ-কাল?'

প্রফুল্ল বলল, 'কি করি বল। অভাবে—'

ঘরের ভিতর থেকেই ডাক ছাড়লেন স্নেহলতা, ও মল্লী, প্রফুল্ল কি ফিরে গেল না কি? রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা তোদের? আয়, ভিতরে আয়, ঘরে আয়।'

মল্লিকা হেসে বলল, 'এসো, ঘরে এসো তারপর বউ কেমন আছে?'

জিজ্ঞেস করতে বুকটা একটু দুলে উঠল, গলাটাও যেন একটু কাঁপল মল্লিকার।

প্রফুল্ল হেসে উঠল, 'কেবল বউ? ছেলে-পুলে নাতি-নাতনীর কথা জিজ্ঞেস করলে না?'

মল্লিকার বুকের পাথর যেন নেমে গেল, তবু একটু সংশয়ের সুরে বলল, 'সত্যি, এখনো বিয়ে করোনি তুমি?'

প্রফুল্ল বলল, 'ক্ষেপেছ। ফেরিওয়ালাকে মেয়ে দেয় না কি কেউ?'

মল্লিকা একটু চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বলল, 'দেয় কি না দেয়, দেখা যাবে। এবার এসো, আর দেরী করো না।'

প্রফুল্ল লক্ষ্য করল আগেকার মত লজ্জা-সঙ্কোচ আর নেই মল্লিকার। অনেক প্রগল্‌ভা হয়েছে। অনেক বদলে গেছে। তাতে কি হয়েছে? প্রফুল্লও কি বদলায়নি?

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। আর এক ঘর মাত্র ভাড়াটে থাকে এ বাড়িতে। নতুন স্বামী-স্ত্রী। মাত্র বছর খানেক বিয়ে হয়েছে। অফিস কামাই করে অরুণবাবু ম্যাটিনী শো'তে সিনেমা দেখতে বেরিয়েছেন বউকে নিয়ে। যেতে যেতে তালা-বন্ধ দু'খানা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দু'-এক কথায় অরুণবাবু আর তার বউয়ের কাহিনী প্রফুল্লকে শুনিয়ে দিল মল্লিকা, তার পর ছোট্ট প্যাসেজটুকু পার হয়ে নিজেদের ঘরে এসে ঢুকল।

মাঝারি ধরণের একখানা ঘর। আধখানা বাজে কাঠের এক জোড়া তক্তপোষে জোড়া। নিচে বাক্স-প্যাঁটরা হাঁড়ি-কুঁড়ি গৃহস্থালীর নানা রকম দরকারী আধা দরকারী জিনিষ।

স্নেহলতা সস্নেহে আমন্ত্রণ জানালেন, 'এসো প্রফুল্ল, এসো। 'আহা, জুতো নিয়েই এসো, তাতে দোষ হবে না।'

প্রফুল্ল এসে তক্তপোষে বসল, নামিয়ে রাখল কাঁধের কাপড়গুলি।

স্নেহলতা বললেন, 'ভালো হয়ে বসো বাবা! ঈস, কি রকম ঘেমে গেছে দেখ। দাঁড়িয়ে রইলি কেন মল্লিকা, পাখাটা নিয়ে আয়, একটু বাতাস কর।'

তালের পাখাখানা নিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগল মল্লিকা।

স্নেহলতা বললেন, 'একটু দোকান-টোকানের মত দিয়ে বসলে হয় না? অবশ্য কিছুতেই কিছু দোষ নেই আজ-কাল। কত জনে কত কি করে খাচ্ছে। চুরি-বাটপাড়ি না করলেই হোল, কিন্তু রোদে-রোদে এমন করে ঘুরে বেড়াতে কষ্ট তো হয়!'

প্রফুল্ল বলল, 'হ্যাঁ! এবার একটু দোকানের মতই দেব ভেবেছি। উল্টাডিঙির ওদিকে একখানা ঘরেরও খোঁজ পেয়েছি। কথাবার্তাও সব এক রকম ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে। এবার একটা ভালো দিন-টিন দেখে—'

'তা তো বটেই। শুভ কাজ কি অদিনে অক্ষণে হয় বাবা? ভালো দিন-টিন নিশ্চয়ই দেখে নিও।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে আর একটু ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে স্নেহলতা বললেন, 'বিয়ে-টিয়ে করেছ না কি?'

প্রফুল্ল লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে মাথা নাড়ল, 'করলে তো শুনতেই পেতেন। তারপর ফের মুখ তুলে বলল, 'ওসব কথা ভাববার সময় কই মাসীমা। ভুগে ভুগে দাদা মারা গেলেন। বউদি, তিনটি ভাইপো-ভাইঝি, কাউকেই তো ফেলবার জো নেই। অথচ এ বাজারে—'

'তোমার বাবা আছেন না প্রফুল্ল?'

'আছেন। কিন্তু সে না থাকারই সামিল। চলতে-ফিরতে পারেন না। ভালো করে চোখে দেখতে পান না। সবই আমাকে দেখতে হয়।'

স্নেহলতা বললেন, 'তুমিই উপযুক্ত ছেলের কাজ করছ বাবা। আর আমি সব শত্রু ধরেছিলাম পেটে। ছেলে একবার খোঁজ খবর

ও নেয় না বউ নিয়ে আলাদা হয়ে রয়েছে। নইলে আমার কিসের দুঃখ বল। ছেলেই যদি ছেলের মত হোত তাহ'লে কি বুড়ো বয়সে ওঁকে অত কষ্ট করতে হয়, না আমার মল্লিকা—'

আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন স্নেহলতা, মল্লিকা তাড়াতাড়ি প্রফুল্লর মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল, 'এই কাঁঠালী চাঁপা রঙের কাপড়টার গজ কত করে?' 'প্রফুল্লদা' কথটা আর উচ্চারণ করল না মল্লিকা।

প্রফুল্ল বলল, 'কত করে তা জেনে কি হবে? তোমার ক'গজ দরকার তাই বল।'

মল্লিকা বলল, 'বাঃ, দর-দাম না করে জিনিস কিনব কেন? যদি ঠকিয়ে দাও।'

স্নেহলতা কৃত্রিম ধমকের সুরে বললেন, 'চুপ কর মুখপুড়ী। তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না প্রফুল্ল।'

মল্লিকা মা'র কথায় কান না দিয়ে বলল, 'আর এই আশমানা রঙের পপলিনটা?' দু'হাতে রঙীন কাপড়গুলি ঘাঁটতে লাগল মল্লিকা। মন যেন রঙের সমুদ্রে ডুব-সাঁতার কেটে চলেছে।

স্নেহলতা বললেন, 'যত সব আদেখলেপণা! ও সব রেখে প্রফুল্লকে একটু চা-টা করে দিবি তো দে।'

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, 'না না, এত গরমে চা আমি খাই নে। চা'র দরকার নেই।'

কিসের যে দরকার তা জানে মল্লিকা। কাপড়ের থানগুলি সরিয়ে রেখে মল্লিকা উঠে গিয়ে তাক থেকে কাচের গ্লাসটা পেড়ে নিল। চা খাওয়ার জন্য সামান্য একটু চিনি আছে কৌটোয়। উপুড় করে ঢালল গ্লাসের মধ্যে। তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যেই একগ্লাস সরবৎ এনে প্রফুল্লের সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রফুল্ল বলল, 'আবার এ সব কেন।'

কিন্তু সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে নিল গ্লাসটা। নেওয়ার সময় আঙুলে আঙুলে ছোঁয়া লাগল। ফিরিয়ে নেওয়ার সময়ও তেমনি।

তারপর প্রফুল্ল বলল, 'পচ্ছন্দমত যে কোন কাপড় থেকে দু'গজ কাপড় তুমি রাখ মল্লিকা।'

স্নেহলতা বাধা দিলেন, 'না না, কাপড়ে দরকার নেই প্রফুল্ল। ব্লাউসের অভাব আছে না কি বাক্সে। যত আদেখলেপণা।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ভগবান যদি মুখ তুলে চান, যদি নিতে দেন তখন নেব প্রফুল্ল, এখন থাক।' গজ নয়, গজপতির দিকে দৃষ্টি স্নেহলতার। বললেন, 'কবে আসবে ?'

প্রফুল্ল বলল, 'আসব এক দিন।'

এক দিন নয়। এই রবিবারে এসো। দুপুরে এখানে খাওয়া-দাওয়া করবে। মল্লিকার বাবাকেও থাকতে বলব। দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বর্ত্তা হবে তাঁর সঙ্গে।'

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়ল। কাপড়ের থানগুলি ফের তুলল ঘাড়ে। আবার যেন ভারি ভারি লাগল জিনিসগুলি।

স্নেহলতা মেয়েকে বললেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস প্রণাম কর।'

দু'জনেই ভারি কুণ্ঠিত। স্নেহলতা তো জানেন না, অত ঘটা করে প্রণামের রেওয়াজ নেই আজ-কাল।

তবু একটু মজা করবার জন্য নীচু হয়ে প্রফুল্লর পায়ের ধুলো নিল মল্লিকা। তার পর মাথা তুলতেই প্রফুল্লর ঝুল-পকেটে মাথা ঠুকে গেল। আর খবর-কাগজে মোড়া একটা পুলিন্দা পকেট থেকে ছিটকে এসে মেঝেয় পড়ল।

মল্লিকা অবাক হয়ে বলল, 'এটা কি ?'

প্রফুল্ল একটু যেন চমকে উঠল, তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ও কিছু নয়, একটা শাড়ী।,

'শাড়ি ? কার শাড়ি ? আবার কুঞ্চিত হোল মল্লিকার ভ্রূ। অবশ্য পরের মুহূর্ত্তেই প্রফুল্লর হাসিতে তার অমূলক আশঙ্কা দূর হোল।

প্রফুল্ল বলল, 'খদ্দেরের শাড়ি। বিক্রির জিনিস। যে নেবে তার।'

মল্লিকা বলল, 'দেখি, দেখি, কি রকম জিনিস। খুলব ?'

প্রফুল্ল বলল, 'আমি খুলে দেখাচ্ছি।'

তারপর সযত্নে কাগজের মোড়ক খুলল প্রফুল্ল। একটা ভাঁজ খুলে মল্লিকার সামনে ধরে রেখে বলল, 'দেখ।'

দেখবে কি, মল্লিকা অপলকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। গাঢ় লাল, আগুনের রঙের শাড়ি। ছুঁতে সাহস হয় না। রুদ্ধশ্বাসে মল্লিকা বলল, 'কি কাপড় এটা, কত দাম?'

প্রফুল্ল বলল, 'বিষ্ণুপুরী সিল্ক। বাজারে পঁচাত্তরের এক পয়সা কমেও কেউ দেবে না। আমি পঁয়ষট্টীতে দিতে পারি।'

পঁয়ষট্টি! সে যে কতগুলি টাকা! অত টাকার শাড়ি পরবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না মল্লিকা। কিন্তু শাড়িখানা যে স্বপ্নের চেয়েও চমৎকার, সিল্কের কাপড়ের কেবল নামই শুনেছে মল্লিকা, ছুঁয়ে দেখেনি, পরে দেখেনি। কি রকম লাগে পরতে, কি রকম অনুভূতি হয়! কোন আনন্দের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া চলে!

প্রফুল্ল আবার দু'-একটা ভাঁজ খুলে দেখাল, যত খোলে তত যেন চোখ ঝলসে যায়, আগুন লাগে রক্তে।

প্রফুল্ল বলল, 'একেবারে আনকোরা নতুন'। নতুন তো বটেই, কাগজে আঁটা দোকানের নাম লেখা রয়েছে ইংরেজীতে। মল্লিকা লক্ষ্য করে দেখেছে।

প্রফুল্ল আবার বলল, 'ঘর থেকে পা বাড়ালেই পঁচাত্তর, তার ওপর সেল-ট্যাক্স্। একটি পয়সা কমে কেউ এ জিনিস দিতে পারে না। আমি পঁয়ষট্টিতে—'

হঠাৎ যেন চমক ভাঙল প্রফুল্লর। এ সব সে কার কাছে কি বলছে! মল্লিকার মত অনেক মেয়ে, অনেক বউ প্রফুল্লর শাড়ির মহার্ঘতার কথা জেনেছে বলে মল্লিকাকেও কি তাই জানতে হবে?

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি শাড়িখানা ভাঁজ করে কাগজে জড়িয়ে নিল। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলল, 'যাই আজ। মহাজনের মাল

কি না। না হলে পঁয়ষট্টি হোক, পঁচাত্তর হোক, কিছুতেই পিছ-পা হতাম না।'

মল্লিকাও সহজে পিছ-পা হবে না। প্রফুল্লর পিছনে পিছনে গিয়ে নীচু-গলায় বলল, 'সদরের কাছে একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি আসছি।'

লুব্ধ এক জোড়া চোখ মল্লিকার দেখতে পেয়েছে প্রফুল্ল। কেবল মল্লিকার নয়, নাম-না-জানা গৃহস্থ-ঘরের আরো কত বউ-ঝি, কিশোরী-প্রৌঢ়ার চোখও এমনি চক্-চক্ করে প্রফুল্লর বিষ্ণুপুরী সিল্কের রঙে। তারপর পঁয়ষট্টি টাকার কথা শুনে মল্লিকার মত অনেকেই চুপসে যায়। আরো কিছু কমে হয় না? কত কম? এই ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মধ্যে?

প্রফুল্ল হেসে ওঠে। কখনো বা রাগ করে চলে যায়। যেন মহা অপমানিত হয়েছে। কিন্তু রাগ করে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। একটু বাদে ফের এসে জানালায় দাঁড়ায়। মধুর কণ্ঠে ডাকে, 'কই দিদিমণি, আসুন! যেতে-যেতেও যেতে পারলাম না। আপনারা যদি অমন অবুঝের মত কথা বলেন, একটু বুঝে-শুঝে বলুন। যাতে আপনিও গাল না খান, আর এই গরীবও না মারা যায়। পঞ্চাশটা টাকা ফেলে দিন।'

প্রফুল্ল ফিরে আসায় দিদিমণি কি বউদি রাণীর মুখখানাও বেশ খুশী-খুশী দেখা যায়, 'আরো পাঁচ টাকা কমাও! পঁয়তাল্লিশ টাকায় দিয়ে যাও। তোমাকে সত্যি বলছি, এর বেশি আর আমার কাছে নেই। দিয়ে যাও শাড়িখানা, দোহাই তোমার।'

প্রফুল্লর মন গলে যায়, বলে, 'অনেক লোকসান হোল, কিন্তু আপনি যখন বলছেন অত করে, যা পারেন তাই দিন।'

বউ-ঝিরা ভয়ে ভয়ে আঁচলের গিঁট খুলে জানালা দিয়ে পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোটগুলি গলিয়ে দেয় প্রফুল্লর হাতে। প্রফুল্ল খবরের কাগজে জড়ানো সেই বিষ্ণুপুরের সিল্কের বাণ্ডিলটা তুলে দেয়

করপল্লবে। তার পর মধুর হেসে জোড় হাতে নমস্কার করে, 'গাল দেবেন না। মন্দ বলবেন না যেন।'

তার পর দ্রুত-পায়ে জানলার কাছ থেকে সরে যায়। মোড়ের পানওয়ালা, বিড়িওয়ালাকে দু'টো টাকা বখরা ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে চলন্ত বাস-ট্রামের হ্যাণ্ডেল ধরে।

বিষ্ণুপুরী সিল্কের শাড়িখানা কেবল মহাজনের মাল নয়, প্রফুল্লর ব্যবসার মূলধন। এ জিনিস কি করে হাতছাড়া করবে প্রফুল্ল। যদি করতে পারত, তাহ'লে মল্লিকার চেয়ে বেশী যোগ্য, বেশী সুন্দর হাত আর কার ছিল।

দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই মল্লিকা উর্ধশ্বাসে ফিরে এল। প্রফুল্লর প্রায় বুকের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'শোন। মা'র কাছে ছিল দশ টাকা। আর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পনের টাকা জমিয়েছিলাম। এই নাও। আমার কাছে আর কিছু নেই।'

প্রফুল্ল ভারি দুঃখিতভাবে বলল, 'কিন্তু মল্লী, ও শাড়ীর দাম যে অনেক বেশী।'

আসল দামের চেয়েও যদি বেশি দামী না হোত জিনিসটা যদি দিয়ে দেওয়া যেত, যদি ছেড়ে দেওয়া যেত!

মল্লিকা মুখ-ভার করে বলল, 'ঘর থেকে টাকা যখন বের করেছি, তখন এ টাকা আর ফিরিয়ে নেব না। কাল তুমি আমার জন্য পঁচিশ টাকার যোগ্যই আর একখানা শাড়ি নিয়ে এসো। মা'র কাছে আমার মুখ থাকবে।' বলে নোট আর কাঁচা টাকাগুলি প্রফুল্লর সার্টের ঝুল-পকেটে গলিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে গেল মল্লিকা।

প্রফুল্ল একবার ডেকে বলল, 'শোন, শোন।'

মল্লিকা শুনল না।

খোলা দরজা দিয়ে গলিতে নেমে পড়ল প্রফুল্ল। চিন্তিত মনে এগুতে লাগল বড় রাস্তার দিকে। শাড়িটা মল্লিকাকে দিয়ে আসতে পারলেই ভালো হোত। অবশ্য দামী শাড়ি, প্রফুল্লর ব্যবসার জিনিস।

কিন্তু মল্লিকা কি আরো দামী নয়? আরো দামী নয় দু'জনের সংসার, মধুর গৃহস্থালী? ব্যবসা? এ ব্যবসা ছাড়া কি ব্যবসা নেই?

মোড়ের পানওয়ালার কাছে আসতেই, পানওয়ালা মৃদু হেসে বলল, 'কই বাবু, আসুন, পান নিয়ে যান আপনার।' তার পর এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে কেবল পানই নয়, প্রফুল্লর পকেটের বাণ্ডিলের মত আর একটি সমান আকারের সমান ওজনের বাণ্ডিল প্রফুল্লর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এই নিন আপনার জিনিস। এবার পানের দামটা—'

প্রফুল্ল কি ভেবে একটা টাকা তুলে দিল পানওয়ালার হাতে।

পানওয়ালা চেঞ্জ না দিয়ে তেমনি হাতের তালু প্রসারিত করে রইল, তার পর কালো কালো দু'পাটি দাঁত বের করে হেসে বলল. 'ছিঃ দোস্ত! অত কমে কি হয়?'

ম্লান মুখে প্রফুল্ল বলল, 'আজ কিছু হয়নি জনার্দ্দন।'

জনার্দ্দন বলল, 'আজ না হয়েছে কাল হবে। পুলিশ আজও এসে ঘুরে গেছে, সেলামী নিয়ে গেছে। এর কমে আমি কিছুতেই পারব না।'

হাতের পাঁচ আঙুল মেলে ধরল জনার্দ্দন।

ক্ষুণ্ণ মনে মল্লিকার টাকা থেকে পাঁচটা টাকা জনার্দ্দনকে দিয়ে দিল প্রফুল্ল। তার পর পুলিন্দাটি হাতে করে ফের সরে এল দোকানের কাছ থেকে। আর নয়, আর এ সব নয়। মল্লিকার জিনিস মল্লিকাকেই আজ সে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। এ ব্যবসার এখানেই শেষ হয়ে যাক। মল্লিকা শাড়ি পরুক। আর তার সেই শাড়িপরা রূপ দেখে চোখ ভরুক, মন ভরুক প্রফুল্লর।

বড় রাস্তা থেকে ফের গলিতে ঢুকল প্রফুল্ল, তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মল্লিকা, একবার শোন।'

গলার সাড়া পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা এসে জানালায় দাঁড়াল, 'ব্যাপার কি?'

'তোমার শাড়ি নাও তুমি।'

কাগজে মোড়া বাণ্ডিলটা শিকের ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিল প্রফুল্ল, 'তোমার জিনিস তুমি নাও।' ভারি অন্যমনস্ক প্রফুল্ল। মুখে বলছে কিন্তু মনে তার হাজার দ্বন্দ্ব, হাজার ওঠা-পড়া, হাজার রাজ্যের ভাবনা।

মল্লিকা বলল, 'না না, সে কি? কাল এনে দেবে, সেই তো কথা ছিল।'

'না না কাল নয়, আজই নাও। কাল হয় তো আর পারব না। অদ্ভুত আবেগ প্রফুল্লর গলায়।

'ভিতরে আসবে না?'

প্রফুল্ল বলল, 'আজ নয়, আরেক দিন আসব। তাড়াতাড়ি নাও, কেউ দেখে ফেলবে।'

সত্যিই একটি লোক যেন দূর থেকে লক্ষ্য করছিল প্রফুল্লকে। লোকটির মুখ যেন চেনা-চেনা। মল্লিকার হাতে কোন রকমে বাণ্ডিলটা গুঁজে দিয়ে প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি জানলার কাছ থেকে সরে এল। তার পর গলির আর এক মুখ দিয়ে বেরিয়ে চলন্ত বাসে উঠে পড়ল।

গোটা কয়েক স্টপেজ ছাড়াবার পর হঠাৎ খেয়াল হোল প্রফুল্লর। তাই তো, কোন বাণ্ডিলটা দিয়ে এসেছে মল্লিকাকে? তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিল। পকেটের বাণ্ডিল পকেটেই আছে। হাতটায় যেন আগুনের ছোঁয়া লাগল। বাস না থামতেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল রাস্তায়।

'কি ব্যাপার, কিছু খোয়া গেছে না কি?' এক সহযাত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, খোয়া গেছে, সব খোয়া গেছে প্রফুল্লর।

তবু মনের সংশয় ভাঙবার জন্য বাণ্ডিলের ওপরের কাগজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল প্রফুল্ল। কোন ভুল নেই। সেই আনকোরা নতুন আগুনের রঙের বিষ্ণুপুরী সিল্ক। প্রফুল্লর ভবিষ্যতের সমস্ত রঙ সে আগুনে ঝলসে গেছে, পুড়ে গেছে ছাই হ'য়ে!

গোটা কয়েক ফিরতি বাস গেল পঁয়ত্রিশ নম্বরের। প্রফুল্ল প্রতি-বার ভাবল উঠে পড়ে। কিন্তু আর উঠে লাভ কি! আর কি উঠবার জো আছে?

এতক্ষণে মল্লিকা মোড়কটা নিশ্চয়ই খুলে ফেলেছে। তারপর বাগবাজার শ্যামবাজার বউবাজারের আরো অনেক তন্বী সুন্দরী বউ-ঝি, কুমারী কিশোরীদের মত মল্লিকাও হতভম্ব, নিষ্পলক চোখে মোড়কের ভিতরের জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রফুল্লর অপূর্ব ম্যাজিকের বলে মল্লিকার সাধের মল্লিকার হাতের সেই বিষ্ণুপুরী সিল্কও এক গজ পাটের চটে এতক্ষণে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে।